।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনবীক্ষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের মধ্যেই যেন বরাবর নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।... একটি বিশেষ ছকের বাইরে এসে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে কখনো ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়নি।"[১] — এই বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে নরেন্দ্রনাথের গল্পে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' (১৩৫২) প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অগ্নিগর্ভ সময়ে। বিক্ষোভ- বিদ্রোহের মধ্যে মানুষ হবার ফলে যুদ্ধ সমকালের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল তেমনি যুদ্ধোত্তরকালে সমাজের বিপর্যয়, মানসিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্ত জীবনের স্থিতিহীনতা ও ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং তা থেকে তিনি মুখ ঘুরিয়ে থাকেননি। ফলে তাঁর রচনায় এই বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে এবং এই সব বিষয় তাঁর রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর গল্পে বিষয়গত বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এর ফলে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁর রচনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। দেশবিভাগ ও তৎপরবর্তী ভারতবর্ষে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি ও দেশবিভাগের পর দেশেই থেকে যাওয়া মানুষের মানসিক যন্ত্রণা উভয়ই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সমান দক্ষতায়। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে অতিবাহিত করা বাল্যকালের স্মৃতি। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, ফলে নরেন্দ্রনাথের গল্পে মুসলিম সমাজ ও চরিত্র উঠে এসেছে সহজ বাস্তবতায়। এই কারণে সমালোচক বলেন—

" একমাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছাড়া আর কোন লেখক নরেন্দ্রনাথের মতো মুসলমান জীবনের পটভূমিকায় এতো বেশি গল্প লেখেননি।"[২]

নরেন্দ্রনাথের গল্পের এই বিষয়গত বৈচিত্র্য থাকলেও তাঁর গল্পের মূল সুর রোম্যান্টিকতা। ১৯৬৮ সালের মে মাসে 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—

"সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। কারণ, আমার লেখায় জীবনের এই সকল দিক খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। যতদূর মনে হয়, শান্তি মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি। মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু তা আমাদের গর্বের বস্তু নয়। যেখানে আমরা মহৎ,

শক্তিমান, সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পাপ আমাকে আকর্ষণ করে না। জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়।তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি। কোন তারুণ্য বা যৌবনের স্পর্শ আমার ভাল লাগে। এবং ভাল লাগার সূত্র ধরে তাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাই। সখ্যপ্রীতির সম্পর্ক আমায় আনন্দ দেয়। আমি সচেতনভাবে সযত্নে সেই সম্পর্কের অনুশীলন করি। আমার কাছে এই সম্পর্কও একটি শিল্প।"

তাঁর এই মানসিকতা তাঁর গল্পের চরিত্র ও বিষয়কে উগ্র বা বিক্ষুব্ধ করে তোলেনি। হৃদয়ের উত্তাপের উষ্ণতা তাঁর গল্পে অনুভব করা যায় কিন্তু সেই উত্তাপ গল্পকে নির্মম করে তোলেনি। এই বিষয়টি সমকালীন অন্যান্য ছোটগল্পকার যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নব্যেন্দু ঘোষের রচনা থেকে নরেন্দ্রনাথের রচনাকে একটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁর গল্পের মূল সুর রোম্যান্টিকতা হলেও এই রোম্যান্টিকতা তাঁর গল্পকে বৈচিত্র্যহীন করে তোলেনি। এই বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর চারশোরও বেশি জনপ্রিয় গল্পকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতেই পারে। তবে এই বর্গীকরণ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তা নয়, কারণ আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় বহুমাত্রিক মানুষের কাহিনিকে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিচয়ে আবদ্ধ করা যায় না। এই কারণে রাজনৈতিক সংঘাতের গল্পেও লুকিয়ে থাকে মনস্তাত্ত্বিক গল্পের উপাদান আবার দেশবিভাগ যে গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় সেখানেও রয়ে যায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। তবুও ছোটগল্প যেহেতু জীবনের একটি নির্দিষ্ট দিক বা মুহূর্তকেই আলোকিত করতে চায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গল্পগুলিকে কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বিচারে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

১. মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প বা মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ মূলক গল্প।

২. নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বা প্রেমের গল্প।

৩. রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্প।

৪. দেশবিভাগ পরবর্তী জীবন সংগ্রামের গল্প। এই শ্রেণির গল্প গুলিকে আবার ২টি উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—

ক. দেশবিভাগের পর ভারতবর্ষে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি অবলম্বনে লেখা গল্প এবং

খ. দেশবিভাগের পর দেশেই থেকে যাওয়া মানুষকে নিয়ে রচিত গল্প।

৫. সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্প।

৬. ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প ও কিশোর গল্প।

৭. মৃত্যুচেতনা প্রকাশক গল্প।

এছাড়াও এমন কিছু ছোটগল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেছেন যাদের উপরোক্ত কোনো শ্রেণিতে যথাযথ ভাবে স্থান দেওয়া যায়না । এই নানা শ্রেণির গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনবীক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানবমনস্তত্ত্ব-বীক্ষা ঃ

সমালোচক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আপাত শান্ত বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনে যে এত রহস্য ছিল তা নরেন্দ্রনাথ না উদ্‌ঘাটন করে দিলে আমরা জানতেই পারতাম না। মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনে তিনি নির্মম নিপুণ।"[৩]

প্রকৃতই নরেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, নিবিড় উপলব্ধি ও অনুভূতিময়তা নিয়ে ডুব দিয়েছেন মানুষের মনের গভীরে এবং সেখান থেকে তুলে এনেছেন তাদের 'আতেঁর কথা' আর সেই 'কথা'কে তাঁর ছোটগল্পে প্রকাশ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। মানব মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার নরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রস'। বহু আলোচিত ও চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত 'রস' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। মুসলমান সমাজ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই গল্পটি আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি উক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে"— নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে আছে তারই প্রাধান্য।"[৪]

প্রকৃতই বিভিন্ন ঘটনার পিছনে মানব মনের বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এক অপরূপ রূপ লাভ করেছে 'রস' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র তিনটি। যথা— মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানু। এই তিনটি চরিত্রের পূর্ববর্তী জীবন, তাদের একাধিক বিবাহের কথা কাহিনিকে দীর্ঘ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জটিলও করেছে। কিন্তু গল্পের অনিবার্য গতি এর ফলে ব্যাহত হয়নি। একদিকে এ গল্পে যেমন মুসলমান সমাজে প্রচলিত রীতি পদ্ধতির বর্ণনা আছে তেমনি খেজুর গাছ থেকে দক্ষ 'গাছি'র দ্বারা খেজুরের রস আহরণ এবং সেই রস থেকে গুড় তৈরির পদ্ধতিরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গ্রামজীবন সম্পর্কে লেখকের অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা গল্পটিকে একটি পৃথক মাত্রা দান করেছে। কিন্তু গল্পে এতসব বিষয় থাকলেও প্রধান হয়ে উঠেছে চরিত্রদের মানসিক বিশ্লেষণ এবং তাতেই গল্পের রসনিস্পত্তি ঘটেছে। খেজুরের রসকে নিয়ে রচিত এই রসের গল্পের একদিকে রয়েছে রূপের প্রতি মোহ অন্যদিকে রয়েছে কর্মের প্রতি আকর্ষণ।

গল্পের নায়ক মোতালেফ পচিশ ছাব্বিশ বছরের এক শক্ত সমর্থ পুরুষ। সে খেজুর গাছ থেকে

রস বের করবার কাজে সুদক্ষ এক 'গাছি'। খেজুর গাছ থেকে রস বের করবার বিদ্যা তাকে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। এই রাজেক মৃধার বিধবা মাজু খাতুনকে সহসা একদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে মোতালেফ। খেজুরের রস থেকে গুড় ও পাটালি তৈরির দক্ষতা মাজু খাতুনের অসাধারণ। মাজু খাতুনের দক্ষতায় ও পরিশ্রমে মোতালেফের পরিশ্রম ও সাধনা সফল হয়। মোতালেফের সংগৃহীত রস থেকে মাজু খাতুন কঠোর পরিশ্রমে উপাদেয় গুড় তৈরি করে। বাজারে সেই গুড় সুখ্যাতি পায় আর প্রচুর আর্থিক লাভ হয় মোতালেফের। এরপরই মিথ্যা অভিযোগে মাজু খাতুনকে তালাক দেয় মোতালেফ এবং বিয়ে করে ঘরে আনে তার পূর্বেই পছন্দ করা পাত্রী চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানুকে। ফুলবানুকে বিয়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ-এর টাকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে মাজু খাতুনকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে মোতালেফ। তাই মাজু খাতুন বলে—" তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমিঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে?" ভর্ৎসনা লাভ করলেও কিন্তু মোতালেফের উদ্দেশ্য পরিপূরিত হয়েছে, ব্যবহৃত- পরিত্যক্ত মাজুখাতুনকে তার আর প্রয়োজন নেই। রূপসী ফুলবানুর সঙ্গে স্ফূর্তির জোয়ারে ভেসে যায় মোতালেফ।" শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পর এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, " এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।" কিন্তু সময় থেমে থাকে না। আবার আসে শীত। পুনরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে মোতালেফ। কারণ "রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন।" গ্রামের সেরা গাছি মোতালেফ আগের বছর থেকে আরও কুড়িদেড়েক গাছ বেশি বন্দোবস্ত নেয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরিতে ফুলবানু মাজুখাতুনের ভূমিকা নিতে পরে না। অনেক কষ্টে সে চলনসই মতো গুড় তৈরি করা শিখে নেয় কিন্তু তাতে "দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।" মোতালেফ অন্তরে কষ্ট পায়, ফুলবানুকে তিরস্কারও করে, কিন্তু তার কিছু করার থাকে না। পুরো শীতের মরসুম সে অসহায় ভাবে কাটাতে বাধ্য হয়। "প্রয়োজন ছাপিয়ে ওঠে প্রণয়ের বিলাসকে, জবুরি হয়ে ওঠে অর্থ; আর সেখানে ফুলবানুর ভূমিকা শুধু অকর্মণ্য বিলাসিনীর।"[৫]

মোতালেফের তখন মনে পড়েছে মাজুখাতুনকে। কিন্তু মাজুখাতুন ততদিনে পুনরায় বিবাহ করেছে। সে এখন নাদির শেখের স্ত্রী। কিন্তু পুরো শীতের মরসুমে এক ছটাকও মনের মতো গুড় মোতালেফ তৈরি করতে পারেনি যা বিক্রি করে সে খদ্দেরদের সন্তুষ্ট করতে পারে । তাই খেজুর রসের অভিজ্ঞ রসিক—গুড় অন্তপ্রাণ মোতালেফ থাকতে পারেনি। দুই হাঁড়ি রস নিয়ে সে গেছে মাজু খাতুনের কাছে,ভিখারির মতো আবেদন করেছে সে মাজু খাতুনকে, সেই রস থেকে জ্বাল দিয়ে দুই সের পছন্দসই গুড় তৈরি করে দেবার জন্য। এই গুড় তার সমস্ত মরসুমের ব্যর্থতার গ্লানি ভুলিয়ে দেবে।

সমস্ত শীতকালের পরিশ্রম সফল ক'রে তাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। গল্পের শেষে নাদির শেখ যখন মোতালফের হুঁকোর আগুন নিভে গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে তখন তার উত্তরে মোতালেফ বলে—'না মিঞাভাই, নেবে নাই।' তার এই উক্তি যেন হুঁকোর আগুনের মতো মাজু খাতুনের সঙ্গে তার সম্পর্কের উষ্ণতাকেই ব্যঞ্জিত করেছে।

গল্পের কাহিনি অংশ এখানেই শেষ কিন্তু এরই মধ্যে অতীতের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনি ব্যাপ্তি লাভ করেছে।চরিত্রদের পূর্বজীবন, তাদের একাধিক বিবাহ, খেজুর রস সংগ্রহ, জ্বালানি সংগ্রহ, খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির বিস্তারিত বর্ণনা গল্পে আছে যা গল্পকে দীর্ঘ করেছে এবং গল্পের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। গ্রামীণ জীবন বিশেষত গ্রামীণ মুসলিম সমাজের নিখুঁত চিত্রও স্বল্প পরিসরে নিখুঁত পরিস্ফুট হয়েছে এই গল্পে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গল্পের মূল প্রোথিত মোতালেফ- মাজু খাতুনের মনের গভীরে। এ গল্প এক মানবিক অনুভূতির গল্প।" খেজুর রসকে অবলম্বন করে রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকার সংঘাত।"[৬]—এ কথা বলে 'রস' গল্পের বিষয়কে সরলীকৃত করা যায় না। মোতালেফ ফুলবানুকে বিবাহ করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছে মাজু খাতুনের গুড় তৈরির দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। এই প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে সে মাজু খাতুনকে বিবাহ করেছে। ফুলবানুকে বিবাহ করার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পর সে মাজু খাতুনকে তালাক দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তার নীতিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোতালেফের এই ন্যায়নীতি বিগর্হিত অমানবিক আচরণ ও সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সে যে তার স্ব-ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত গুণী বা শিল্পি মানুষ সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর তার স্ব-ক্ষেত্র হল খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাজ। লেখক কাহিনির বর্ণনার অংশে খেজুর গাছের সঙ্গে মোতালেফের একাত্মতাকে বহুভাবে প্রকাশ করেছেন। খেজুর গাছ থেকে মোতালেফের রস সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনায় সেই একাত্মতাই পরিস্ফুট—" যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছর ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এতো আর ধানকাটা নয়, পাটকাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুড়িতে খাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।" খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবার পেশা মোতালেফকে খেজুর গাছের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত করেছে। এই অন্তরের সম্পর্ক মোতালেফকে রসের মরসুমে ফুলবানুর প্রেমকেও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই শীতের রাতে ফুলবানুর মনে হয়—" মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে।" সে নিজে যেমন

শিল্পি তেমনি মাজু খাতুনের দক্ষতাকেও সে শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে ফুলবানুর রূপেরও সে পূজারী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জীবনে রূপাসক্তি ও দেহসম্ভোগ বাসনা যে জয়ী হতে পারেনি তার মূলেও রয়েছে খেজুর গাছ ও তার রস। সে ফুলবানুকেও খেজুর রস থেকে গুড় তৈরির শিল্পি তৈরি করতে চেয়েছে কিন্তু ফুলবানুর ব্যর্থতাই তাকে ফুলবানুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই তার স্মরণে এসেছে মাজু খাতুনের কথা। কারণ মাজু খাতুনের সঙ্গে তার সম্পর্কেরও অনেকাংশ জুড়ে ছিল খেজুরের রস—" হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজু খাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু খাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে ; সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।"— এই খেজুর রস অর্থাৎ কর্মের সম্পর্ক, শুধু কর্মই বা বলা যায় কি করে, বলা যেতে পারে ধর্ম—এই ধর্ম মোতালেফ ও মাজু খাতুনের অন্তরের সম্পর্ক রচনার প্রধান উপাদান। তাই যখন অন্যের স্ত্রী হয়ে মাজু খাতুন মোতালেফকে ভর্ৎসনা করে তখন সেই কঠিন ও রূঢ় তিরস্কারও মোতালেফকে ক্রুদ্ধ করেনি। বরং এই ভর্ৎসনার মধ্য দিয়ে মাজু খাতুনের বঞ্চিত নারী হৃদয়ের অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠই তার কানে বেজেছে। মোতালেফের মনে হয়েছে যেন—" ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।" খেজুর রসের এতবড় শিল্পি মোতালেফের অসহায়তা, মনমতো গুড় বিক্রি করতে না পারার বেদনা অপর শিল্পি মাজু খাতুনকেও স্পর্শ করেছে। তাই মাজু খাতুনের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। লেখক বলেন—"বাখাঁরির বেড়ার ফাঁকে চোখ পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে।" এইখানেই একজনের মনের বেদনা, মানবিক আবেদন অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে আর 'রস' গল্পটিকে অসাধারণ মানবিক মহিমা দান করেছে। লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দক্ষতা গল্পটিকে শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন করেছে। সমালোচক যথার্থই বলেন—" এই শ্রম ও প্রেমে বাঁধা যে যৌথ জীবন বোধের আর্তি— তাতেই গল্পে জড়িয়ে যায় মোতালেফ ও মাজু খাতুন।"[৭]

নরেন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক চেতনাটি উপলব্ধি করা যায় তাঁর 'অভিন্নহৃদয়' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে। 'অভিন্নহৃদয়' প্রকাশিত হয় ১৩৮২ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। মাঝারি আয়তনের এই ছোটগল্পটি ৯টি পাতায় সীমায়িত। অসিত, দোলা ও প্রণব এই তিনটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পের মূল সুর বা বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে গল্পেরই একটি পংক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে, আর তা হল—" বিশ্বাস স্থাপন বিশ্বাস ভঙ্গ আর তার জন্যে অনুশোচনার পীড়ন।" গল্পের মধ্যে একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি থাকলেও সেই কাহিনি গল্পের পশ্চাদ্‌ভূমি বা পটভূমি রচনা করেছে মাত্র, গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। প্রেমের গল্পটি তাই রয়ে গেছে পেছনের সারিতে, প্রধান হয়ে উঠেছে চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তাদের মানসিকতার পরিস্ফুটন। তবে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে

দুটি স্বল্পাকার অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে প্রেমের কাহিনিটি। গল্পের মূল বিষয় প্রণব-দোলা ও অসিতের পূর্ব সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ভাঙন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মানসিক অবস্থার বিবর্তন। একদা দোলাকে কেন্দ্র করে প্রণব ও অসিত এই দুই বন্ধুর বন্ধুত্বে যে ফাটল ধরেছিল, যে ফাটলকে একসময় মনে হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য, তাই কালের প্রহারে অতি সামান্য, অতি নগণ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। মাত্র আট বছরের ব্যবধান তাদের সম্পর্কের তিক্ততাকে অনেকাংশে প্রশমিত করে দিয়েছে। অতীত স্মৃতি দুজনকেই হয়তো তাড়িত করেছে কিন্তু তা তীব্র হয়ে পরস্পরকে অভিভূত করে ফেলেনি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহারও হয়তো তারা পরস্পরের প্রতি করতে পারেনি আর তা খুব অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ভালোবাসা, ক্রোধ, রাগ বা ঘৃণা কোনো অনুভূতিকেই যে মানুষ, বিশেষ করে আধুনিক মানুষ চিরকাল সমানভাবে ধরে রাখে না, ধরে রাখতে পারেনা সেই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে গল্পের মধ্যে। দোলার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রণব গেছিল ডুয়ার্সে চাকরি করতে কিন্তু বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগে অসিত দোলাকে বিবাহ করে এবং তা ঘটে দোলার সম্মতিতেই। বন্ধু ও প্রেমিকার এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে প্রণব কিছুকাল বিবাগী বাউণ্ডুলে জীবন কাটানোর পরে ধাতস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করেছে। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহ করেছে প্রণব এবং যমজ সন্তানের পিতাও হয়েছে। দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব দোলার বিবাহের পর শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছিল, দেখা হলে প্রবল বিতৃষ্ণায় তারা পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । কিন্তু এই বিরূপতাকে তারা ধরে রাখতে পারেনি,তাই অসিত পূর্বের বন্ধুত্ব লাভ করবার জন্য এগিয়ে এসেছে প্রণবের দিকে, আর প্রণবও প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সেই ডাকে সারা দিয়েছে। পূর্বস্মৃতি তাড়িত করলেও আধুনিক সুসভ্য পরিশীলিত মানুষ তাকে দাবিয়ে রেখে সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধকে জয়ী করেছে। কারণ বর্তমান যুগে— "সেই প্যাশন্ আর কোন কিছুর মধ্যে নেই। না প্রেমে না বন্ধুত্বে না হিংস্র শত্রুতায়।" কারণ— "আলস্য, ঔদাস্য আর জড়তা সব ঢেকে দিয়েছে।" কোনো অনুভূতি কোনো সংরাগকেই মানুষ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছেনা। তাকে আলস্য গ্রাস করছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ সব কিছু ভুলে গেছে। তাই প্রণব নিমন্ত্রিত হয়েও সময়মতো অসিতের বাড়িতে আসছে না দেখে—" অসিতের ছটফটানির শেষ নেই।" যখন অসিত জানতে পেরেছে প্রণব অভিমান বা পূর্বের প্রতারণাকে বিস্মৃত হতে না পারার কারণে নয় বরং শারীরিক অসুস্থতার জন্যই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি, তখন সে মানসিকভাবে শান্তি লাভ করেছে— " কারো অসুখ হয়েছিল শুনে এত সুখী অসিত বোধ হয় আর কখনো হয়নি।'

তাই পূর্বস্মৃতির তাড়না আছে, পূর্ব অভিজ্ঞতার অস্বস্তিকর অনুভূতি আছে কিন্তু সেই পূর্ব আবেগের তীব্রতা নেই, পূর্ব অনুভূতির উন্মাদনা নেই। তাই— " তখনকার মধুর আর তিক্ত মৃদু আর

তীব্র অনুভূতিগুলিও যেন তেমনি এক অপরিচয়ের আবরণে আচ্ছন্ন।" মানুষগুলিও যেন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে পৃথক মানুষে পরিণত হয়েছে, মনে এবং মানসিকতায়। তাই অসিতের মনে হয়েছে, যে দোলা তার গৃহিণী, সে যেন সেই পূর্বেকার দোলা নয়, সে নিজেও যেন আগের সেই অসিত নয়। শুধু অসিত নয়, অসিত ও প্রণব উভয় বন্ধুই এই একই মানসিকতার অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে কেবল অসিত ও প্রণব নয় বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষই এই উদাসীনতার শিকার। অসিত ও প্রণবের ভাবনা ও চিন্তা একই দিকে ধাবিত হয়েছে আর সেই সূত্রে গল্পের নামকরণ 'অভিন্নহৃদয়'ও সার্থক হয়ে উঠে। গল্পের শেষাংশে একটি সংলাপে এই আচ্ছন্ন কালের বৈশিষ্ট্য যেমন সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি গল্পের মনস্তত্ত্বটিকেও প্রকাশ করেছে—

" 'তখন বোধহয় তুই আমাকে খুন করে ফেলতে পারতিস।'

প্রণব অন্যমনস্কের মত বলল, তা পারতাম।'

অসিত বলল, ' আর এখন?'

প্রণব বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, ' এখন পিনের খোঁচা দিতেও আলস্য লাগে।' "

নরেন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় 'জৈব' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে আলোচিত দুটি গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কথনরীতির পার্থক্য আছে।এই গল্পটি উত্তম পুরুষ কথনরীতির, আর এই গল্পের কথক চরিত্রটি কাহিনির একজন চরিত্র বটে কিন্তু ঠিক অন্তর্বৃত বা Involved চরিত্র নয় বরং সাক্ষীচরিত্র ফলে গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রের মন-মনস্তত্ত্বের অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যান গল্পে নেই কিন্তু চরিত্রদের বাহ্যিক আচরণ ও সামান্য সংলাপই তাদের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকটটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে।

গল্পের সূচনা হয়েছে একটু অদ্ভুত ভাবে। রেডিওতে প্রচারিত একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ শুনে লেখকের বন্ধু ডাক্তার বাসব একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন এবং সেই বক্তৃতা শুনে বক্তৃতাকারীর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে দুঃখ পেয়েছেন। ডাক্তারবাবুর এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গল্প শোনাবার পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং গল্পের মূল কাহিনি এই ডাক্তারবাবুর জবানিতে উঠে এসেছে।

দেশভাগ-পরবর্তী ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্কলার ও কলেজের অধ্যাপক মৃগাঙ্ক মজুমদারের স্ত্রী লাহোরে আত্মীয় বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই দাঙ্গার সময় দুষ্কৃতিরা তাকে নিগ্রহ করে। দীর্ঘ তিনমাস পরে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, কিন্তু শারীরিক নিগ্রহের ফলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও অবাঞ্ছিত গর্ভ সঞ্চারের ফলে এক তীব্র অশুচিতার অনুভূতি মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী সুদত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে কোনো মূল্যে তিনি তার এই গর্ভস্থ শিশুকে

জন্মদান থেকে বিরত থাকতে চান। যে মাতৃত্ব-যে কোনো মায়ের কাছে গর্ব ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু সেই মাতৃত্বের কারণে সুদত্তা মানসিক রোগী বা ' আধা- হিষ্টেরিক' অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, যেহেতু এ মাতৃত্ব কাঙ্ক্ষিত নয়, দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্মের ফল। চার মাসের গর্ভাবস্থা থাকায় কোনো ডাক্তার সুদত্তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দান করতে সম্মত হয়নি, কিন্তু সুদত্তা বেপরোয়া হয়ে গেছে, এমনকি মৃত্যুও তার কাছে এই মাতৃত্ব অপেক্ষা অধিক কাঙ্ক্ষিত বলে বোধ হয়েছে। লেখক সুদত্তার মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— " 'জীবনের Risk' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন সুদত্তা,' আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনা, কিছুতেই না। দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন। চিরকালের জন্য কতৃজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।"

নিজের নারীত্বের চূড়ান্ত অপমানের সাক্ষীহিসেবে সুদত্তা মনে করেছে তার গর্ভস্থ শিশুকে। ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছু সুবিধে না হওয়ায় সে নিজের শরীরের উপর চরম অনিয়ম ও নিপীড়ন করেছে। ডাক্তারের কাছে নিজের ঘৃণা, বিতৃষ্নাকে প্রকাশ করেছে এমনকি যেনতেন প্রকারে ভ্রূণ হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞান পিসী শাশুড়ী যখন সুদত্তার সাধের আয়োজন করেছেন, তখন সুদত্তা অনুষ্ঠানের সকল উপকরণ সবার অলক্ষে নর্দমায় ছুড়ে ফেলেছে, এই অনুষ্ঠান তার কাছে নিজের অপমান বলে বোধ হয়েছে। সকল প্রচেষ্টার পরেও যখন সুদত্তা তার সেই অবাঞ্ছিত শিশুকে জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছে তখন জন্মাবার পরেই সেই নবজাতককে পরিত্যাগ করবার বন্দোবস্ত করেছে সে, নার্সদের টাকা দিয়ে সেই শিশুকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব যে অতীব জটিল, কোনো সহজ সূত্র যে সেই মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা দিতে পারেনা সেই কথা পুনরায় প্রমাণিত হয়ে গেছে । যে সন্তান সুদত্তার কাছে ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মত, সেই সন্তানের জন্মের পর সুদত্তা স্বাভাবিক মাতৃত্বের অনুভূতিই লাভ করেছে, ঘৃণা রূপান্তরিত হয়েছে বাৎসল্য রসে, অপমানের বোধ রূপান্তরিত হয়েছে গর্বিত মায়ের উপলব্ধিতে। লেখক সুদত্তার এই মানসিক পরিবর্তনকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— " ... সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।" মৃগাঙ্কবাবুরও মনে হয়েছে এই সন্তান গ্রহণে কোনো জটিলতা নেই কারণ—"মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।"কাহিনির এই পর্যন্ত এসে দেখা যায় যে মাতৃত্বের অনুভূতি ও মুক্তিতে নারীর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শুধু এই কারণেই গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিকটি সমাপ্ত হয়নি বরং এর পরেই গল্পের প্রকৃত জটিলতায়

গ্রন্থি পড়েছে। সন্তান জন্ম নিয়ে সুদত্তার এতদিনের অস্বস্তির অবসান ঘটছে আর এই সন্তান জন্মাবার পর শিশুটিকে নিয়ে মৃগাঙ্ক মজুমদার আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। এখানে তার ভূমিকা স্নেহময় পিতার নয় বরং নির্মোহ বৈজ্ঞানিকের। এখন গল্পের সূচনায় যে বক্তৃতাটি মৃগাঙ্ক মজুমদার রেডিওতে বলেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে— "... সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতা মাতা এবং ঊর্ধতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন বিন্যাস থেকে শুরু ক'রে মানসিক গুণাগুণ, বৃদ্ধি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিক প্রভাব—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ..."— এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার, কলেজের প্রফেসর মৃগাঙ্কবাবু প্রকৃত পক্ষে অনুসন্ধান করেছেন মানুষের মধ্যে তার বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক কোনটির প্রভাব অধিক সেই বিষয়টি। এই বিষয়ে তার গবেষণার সামগ্রী আর কেউ নয় তারই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, যার মা সুদত্তা কিন্তু পিতা অন্য কেউ, আর সেই অজ্ঞাত পিতার বংশানুক্রমকে সুদত্তার গর্ভজাত সন্তান কী প্রকারে বহন করে চলেছে সেইটিই মৃগাঙ্কের আগ্রহের বিষয়। সুদত্তার সন্তান বিশু বা বিশ্বেশ্বরের প্রতি মৃগাঙ্ক কোনো অবহেলা করেননা, পিতার সকল দায়িত্ব পালন করেন, দিনে তিন চার বার তার খোঁজ নেন, কোলে ক'রে আদর করেন, চুম্বন করেন। দামি পোষাক, দামি খাদ্য, দামি খেলনা কোন কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিশ্বেশ্বর তার কাছে গবেষণার উপাদান মাত্র, সন্তানের বাৎসল্য অপেক্ষা বিশুর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি এক বৈজ্ঞানিকের। বৈজ্ঞানিক যেমন গিনিপিগের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তেমনি বিশুও তার কাছে এক গিনিপিগ বিশেষ। তাই বিশুকে আদর করেন আর তার পরেই বিশুকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ ক'রে পকেটবুকে নোট করেন। সুদত্তা মৃগাঙ্কের এই মানসিকতাকে সহ্য করতে পারেন না। পিতা যেই হোক না কেন সুদত্তা বিশুর মা আর মা হয়ে নিজের সন্তানকে অন্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিতে তার প্রবল আপত্তি। এই মানসিকতা থেকেই পুনরায় গর্ভবতী সুদত্তা তার গর্ভকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। এবার সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোন জটিলতা নেই, কোন অশুচিতার ভাব নেই কিন্তু এই সন্তান জন্ম নিলে সেই সন্তানও হবে মৃগাঙ্কের পরীক্ষার উপাদান। সুদত্তার আশঙ্কা এই সন্তান ও বিশুকে নিয়ে তুলনামূলক নিরীক্ষায় মাতবে মৃগাঙ্ক আর সুদত্তা সমস্ত জেনেশুনে তার বৈজ্ঞানিক স্বামীকে 'কম্প্যারেটিভ স্টাডির মেটেরিয়াল জোগাতে' চায় না।

এই ভাবে দেখা যায় গল্পে মৃগাঙ্কের বিচিত্র মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।গল্পের কুশীলবদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখকের মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গ্রামের

নিম্ন শ্রেণির মানুষ কিংবা দরিদ্র মুসলমান চরিত্রের সূক্ষ্ম মানসিকতা সম্পর্কে যেমন জ্ঞাত ছিলেন, তেমনই নগরবাসী মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষের মনের গহন- গভীর দিক, তার দ্বন্দ্ব জটিলতার নানা মাত্রা সম্পর্কেও ছিলেন অবহিত।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রেমচেতনা ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'গল্পলেখার গল্প' - এর শেষে বলেছেন— "নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৮] তাঁর এই প্রেমচেতনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ প্রকাশক গল্পে বা এক কথায় তাঁর রচিত প্রেমের গল্পগুলিতে।

এই শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হল 'চাঁদমিঞা' গল্পটি। 'দিগন্ত' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বজ্ঞ রীতিতে রচিত এই গল্পটির কাহিনি অংশের কথক লেখকের বন্ধু মসিয়র। একদিন রেঁস্তোরায় জলখাবার খেতে খেতে মসিয়র তাঁর বাবার আপন চাচা জমিদার নশরৎ আলী মৃধার জীবনের একটি কাহিনি লেখককে শোনান— এই ভাবে অন্য একটি চরিত্রের জবানিতে কথকতার ভঙ্গিতে গল্পের কাহিনি অংশের সূচনা।

এই গল্পে যে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে প্রধান স্থান নশরৎ আলীর নয় বরং তার জন্য গল্পটিতে ত্রিকোণ প্রেমের বাতাবরণ গড়ে উঠেছে। মীরপুর ও তার আশেপাশের পাঁচ-সাতটি গ্রামের জমিদার নশরৎ আলীর একমাত্র অভাব ছিল সন্তানের। ধন-দৌলৎ, লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা পরিপূর্ণ জমিদারিতে এই একটি মাত্র শূন্যতা সর্বগ্রাসী আকার নিয়ে জমিদারকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু এই অপ্রাপ্তির বেদনাকে দূর করবার জন্য নশরৎ আলীর প্রচেষ্টার অভাব ছিলনা। একের পর এক বিবি তিনি ঘরে এনেছেন কিন্তু ইপ্সিত ফল লাভ হয়নি।— " ছেলে তো ভালো, একটি কানা মেয়ের মুখ পর্যন্ত মৃধা সাহেব দেখতে পারেন নি।" ক্রমে কেবল ফকির দরবেশদের কেরামতির উপরই নয় স্বয়ং খোদার অস্তিত্বের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ নশরৎ আলী। কিন্তু সহসা সেই বিশ্বাসের পুনঃজাগরণ ঘটেছে তার অন্তরে আর এই জাগরণের কারণ এক ফকির। কিন্তু এই আইনুদ্দিন ফকিরের কোনো মন্ত্রতন্ত্রের কেরামতি এতে জড়িত নেই। এই আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে তার অষ্টাদশী কন্যা রাবেয়া। অপরূপ সুন্দরী রাবেয়াকে আইনুদ্দিন ফকিরের জীর্ণ কুটিরে নামাজ পড়তে দেখে নশরৎ আলী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাকে মুগ্ধ করেছিল রাবেয়ার রূপ-সৌন্দর্য ও তার অপরূপ আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমাটি। রাবেয়ার আন্তরিক সম্মতি ছাড়াই বৃদ্ধ বয়সে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন নশরৎ আলী। কিন্তু

রাবেয়ার দুর্জ্ঞেয় মনের নিশানা বৃদ্ধ নশরৎ আলী খুঁজে পাননি। রাবেয়ার দেহের রূপ, কণ্ঠের মাধুর্য, স্পর্শের আবিলতা সমস্ত কিছুই মূল্যহীন হয়ে গেছে তার হৃদয়ে নশরৎ এর স্থান না পাবার জন্য। কিন্তু নশরৎ আলী রাবেয়ার মন পেতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তার সমস্ত সম্পদকে তিনি উজার করে দিয়েছেন রাবেয়ার পায়ের কাছে। নশরতের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও একদিন রাবেয়ার মন "বেহেস্ত থেকে একেবারে ধূলামাটির দুনিয়ায় নেমে এসেছে।" তার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে,সে নিজে চুন হলুদ-গরম করে আহত ব্যক্তির সেবা করেছে কিন্তু সে আহত ব্যক্তি নশরৎ আলী নন বরং তারই ঘোড়ার যুবা ও সুপুরুষ সহিস চাঁদমিঞা। সেই চাঁদমিঞা নশরৎ আলীর প্রাসাদের জানালায় দাঁড়ানো রাবেয়াকে দেখে, তার রূপের ছটায় বিহ্বল হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। এই প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছে এবং যার ফল হয়েছে মারাত্মক। যখন নশরৎ আলী অনুভব করেছেন যে,তার সামর্থ্য, তার খ্যাতি, তার ঐশ্বর্য, তার সম্পদ রাবেয়াকে মুগ্ধ করতে পারেনি, তার চোখকে ঝলসে দিতে পারেনি, বরং তাকে মুগ্ধ করেছে,"তারই দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব", তখন তা তিনি সহ্য করেননি। রাবেয়ার প্রতি অনুরক্ত চাঁদমিঞা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতে ঘুমন্ত ঘোড়াকে প্রেমাবশে 'রাবেয়া রাবেয়া' বলে ডাকছিল। তীব্র অসূয়াআক্রান্ত নশরৎ আলী সেই অপরাধে চাঁদমিঞার সর্বাঙ্গ চাবুকের নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রীকে চাবুকের উপর্যুপরি আঘাতে করে তুলেছেন বীভৎস-কদাকার। এই করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, চাঁদমিঞাকে তিনি গুপ্ত কুঠুরিতে আটকে রেখেছেন। রাবেয়ার প্রতিও তীব্র প্রতিহিংসাবশত নশরৎ আলী তাকে নিয়ে গেছেন চাঁদমিঞার কাছে, তার ক্ষতচিহ্ন দেখাবার জন্য। চাঁদমিঞার বিকৃত মুখশ্রী দেখে শিহরিত হয়েছে রাবেয়া। কিন্তু প্রেমের শক্তি, অত্যাচার পীড়ন বা দম্ভের সামনে মাথা নোয়ায়নি।তাই রাবেয়া নশরৎ আলীর অলক্ষে একা ঔষধের ঝাঁপি নিয়ে নেমে গেছে চাঁদমিঞার অন্ধকার কুঠুরিতে। রাবেয়া চাঁদমিঞার ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিয়েছে, শুধু তাই নয়, নিজের হাতের অঙ্গুরীয় চাঁদমিঞার আঙুলে পড়িয়ে দিয়ে তার প্রণয়ের স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, নশরৎ আলী এই দৃশ্য দেখে ফেলেছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা কোনোমতেই সহ্য করেননি। নিজহাতে তিনি রাবেয়াকে হত্যা করেছেন এবং পরদিন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির বলে হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে রাবেয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করে তাকে কবরস্থ করেছেন।

এইখানে গল্পটি সমাপ্ত হতে পারত, কিন্তু মানুষের মৃত্যুতেও যে প্রেমের মৃত্যু হয় না—এই বাণীই যেন গল্পকার ঘোষণা করতে চেয়েছেন। তাই গল্পটি নিছক একটি প্রেমের গল্প হয়ে থাকেনি বা জরার উপর যৌবনের জয়গান রচনা করেই সমাপ্ত হয়নি বরং কিছুটা দৈবিক মহিমা লাভ করেছে। রাবেয়াকে নিজের হাতে হত্যা করার পর চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হলেও শেষ পর্যন্ত

নশরৎ আলী চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে পারেননি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও শেষ জীবনে এই চাঁদমিঞাই হয়ে উঠেছিল নশরৎ আলীর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র এবং তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কও মুছে গিয়ে এক "গভীর সৌহার্দের সৃষ্টি হয়েছিল"। একদা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা পরায়ণ নশরৎ আলীর এই ব্যবহার দুর্বোধ্য মনে হলেও কথক মসিয়র এই ব্যবহারের একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, চাঁদমিঞার হাতে রাবেয়া যে আংটি পড়িয়ে দিয়েছিল সেই আংটির দিকে তাকিয়েই নশরৎ আলী আর চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে পারেননি। এই আংটি ছিল রাবেয়ার স্মৃতিচিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্নের ধারককে নশরৎ আলী হত্যা করেননি। এছাড়া চাবুকের আঘাতে বিকৃত চাঁদমিঞার ক্ষতস্থানের উপর রাবেয়া যেখানে তার নিজের হাতের স্নেহস্পর্শ রেখেছিল— সেই স্পর্শের শেষ উত্তাপটিও নশরৎ আলী চাঁদমিঞার মাধ্যমে রক্ষা করতে চেয়েছেন। ফলে তার প্রিয়তমার প্রিয়কে তিনি জীবনদান দিয়ে নিজের প্রিয়তমার স্মৃতিকেই অন্তরে চির জাগরূক করে রাখতে চেয়েছিলেন। মৃত রাবেয়ার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন হ'ল চাঁদমিঞা, তাই সেই স্মৃতিকেই নশরৎ আলী আজীবন আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। এইভাবে একটি পুরানো স্মৃতি রক্ষিত ভালোবাসা, প্রেম-মনস্তত্ত্বের অসামান্য রূপকার নরেন্দ্রনাথের হাতে দৈবী মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রেমের শক্তি অলৌকিক আর এই অলৌকিকতাই বিশিষ্ট মহিমায় উজ্জ্বল করেছে 'চাঁদমিঞা' ছোটগল্পটিকে। প্রেম অপার্থিব এবং এই অপার্থিব সম্পদের কাছে পার্থিব সকল সম্পদই তুচ্ছ হয়ে যায়, এই বাণীটিই উচ্চারিত হয়েছে গল্পে। গল্পের থেকে কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে। প্রথমেই নশরৎ আলীর কথা বলা যায়, যখন রাবেয়াকে তিনি দেখেন তারপর থেকে তার চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়— "আল্লার দুনিয়াকে তিনি যেন নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন।" রাবেয়াকে বিবাহের পর তার মানসিকতার দুস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এতদিন তার একের পর এক বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল সন্তান লাভ। কিন্তু রাবেয়াকে তিনি সত্য সত্যই ভালোবেসেছিলেন, তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রেমের অনির্বচনীয়তাকে অনুভব করেছিলেন। তাই রাবেয়াকে তিনি একদিন বলেন— "রাবেয়া, এতকাল ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধ'রে দিতে না পারলে স্ত্রীর রূপ বৃথা, তার যৌবন বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্র লাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা ক'রে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।" একই রকম ভাবে রাবেয়াও প্রেমের অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছে। চাঁদমিঞা যে গোপন কুঠুরিতে যন্ত্রণাদীর্ণ অবস্থায় আবদ্ধ রয়েছে সেখানে ঔষধ রূপ গাছ গাছড়া নিয়ে যাবার সময় রাবেয়ার মানসিক অবস্থার বর্ণনায় লেখক সেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—" আর কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই, অদ্ভুত সাহস এসেছে রাবেয়ার মনে।

গাছড়ার ঝাঁপিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেয়েছে। খোদার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সারারাত।"

—এই ভাবে 'চাঁদমিঞা' একটি সার্থক রোমান্টিক প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে। হয়তো এ গল্প বিয়োগান্তক কিন্তু এক ভিন্নতর অপার্থিব মিলনের ইঙ্গিতে উজ্জ্বল।

প্রেমের এমন অপার্থিব মহিমার পরিচয় আমরা এমনভাবেই পাই 'চেক' গল্পে। এই গল্পে সুবিমল ও সরসী দত্তের প্রেম সমস্ত সামাজিক ভ্রূকুটি ও অর্থের হাতছানিকে উপেক্ষা করে জয়যুক্ত হয়েছে। 'চাঁদমিঞা' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের একটি সাদৃশ্যহল এর রচনাভঙ্গি। এখানেও লেখক ভিন্ন এক কথকের জবানিতে গল্পের কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন। তবে 'চাঁদমিঞা'র সঙ্গে এ গল্পের বৈসাদৃশ্যও প্রচুর, এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যে অন্যতম হল এর কাহিনির পরিসমাপ্তি। এই পরিসমাপ্তি 'চাঁদমিঞা' গল্পের মতো বিয়োগান্তক নয় বরং মিলনান্তক। তবে গল্পের রচনাভঙ্গি ছাড়াও 'চাঁদমিঞা'এর সঙ্গে এ গল্পের মূল ও সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য এর বিষয়বস্তুতে। এর বিষয়বস্তুর কেন্দ্রেও আছে প্রেম এবং যে প্রেম পার্থিব সকল বস্তুর আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে । একটি দশহাজার টাকার চেককে ছিঁড়ে ফেলে গল্পের নায়ক সুবিমল যেন গল্পের নায়িকা সরসীর অতীত পদস্খলনকেই ছিঁড়ে ফেলেছে এবং তারপর যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

অনবদ্য এই প্রেমের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, 'দিগন্ত' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। লেখকের একটি চেক লেখার ঘটনায় গল্পকথক পরিতোষবাবুর আরেকটি চেকের গল্প মনে পড়েছে এবং সেই চেককে ঘিরেই এই রোম্যান্টিক গল্পের সূচনা। গল্পটির শ্রেণি নির্ণয়ে লেখকই সহায়তা করেছেন। গল্পের প্রথমেই তিনি গল্প কথককে জিজ্ঞাসা করেন—"রোম্যান্টিক কাহিনী- টাহিনী নাকি।" উত্তরে গল্প কথক পরিতোষবাবু বলেন—" না মশাই রীতিমতন রিয়্যালিস্টিক। অবশ্য শুরু হয়েছিল রোম্যান্টিক ধরনেই।" যে গল্পের সূচনা 'রোম্যান্টিক ধরনের' এবং কাহিনির শেষ অংশ রচিত হয়েছে নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণনায় সে গল্প অবশ্যই প্রেমের গল্প এবং নরেন্দ্রনাথের রচনা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সে গল্প 'রিয়্যালিস্টিক'ও বটে।

'চেক' গল্পের নায়ক সুবিমল এক সদাগরী অফিসের চাকুরে, 'স্ত্রী ভূমিকা- বর্জিত' সেই অফিসে সহসা এক পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। এই পরিবর্তনে অফিসের সবার 'হৃদয় চঞ্চল' ও 'চক্ষুস্থির' হয়ে গেল। এর কারণ এক মহিলা টাইপিস্টের আগমন। অফিসের সকলে এই মহিলার আগমনে যতখানি চঞ্চল ও অধীর হ'ল, সুবিমল ততটা হ'ল না। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেখা গেল অফিসের সহকর্মীদের সমবেত গুঞ্জন ও কৌতূহলী দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে রেখে সুবিমল ও সেই মহিলা টাইপিস্ট সরসী দত্তের বাড়ি ফেরার পথটি ও বাহনটি এক হয়ে উঠেছে। যদিও উভয়ের বাড়ি ভিন্ন দিকে, ভিন্ন রাস্তায়।

কাহিনির এই অংশ পর্যন্ত গল্পটি একটি সাধারণ অফিস প্রেমের গল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং কোন জটিলতার আভাস পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর পরেই গল্পের গ্রন্থিতে গিঁট পড়েছে। সুবিমল ও সরসীর সম্পর্ক সুন্দর, স্বাভাবিক ও মধুর হয়ে উঠেছে, সুবিমলের মনে হয়েছে— "আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ হয়েছে সরসী, অনেক প্রগলভা। দু'জনের কাছে কোথাও আর কিছু দুর্বোধ্য নেই। সব স্পষ্ট, সব প্রাঞ্জল। কোন জট নেই তার জীবনে, কোন জটিলতা নেই।" এইটুকু ভূমিকা করেই গল্পকার তাদের প্রেমের নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠার দিকটি বর্ণনা করেছেন। এর পর সুবিমল ও সরসীর প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। এই আগমনের ভূমিকাও গল্পকার করে রেখেছেন, কোন আকস্মিকতার চমক দেননি— "কিন্তু সুবিমলের ভুল হয়েছিল। জীবন কি সত্যই অত সহজ, অত সরল, অত প্রাঞ্জল ? আর জট কি জীবনে দু'একটি ? জট অসংখ্য। জীবনের এক জট খোলে, আর এক জট জড়ায়। হৃদয়ের এক পাট খোলে, আর এক পাট বন্ধ হয়।"

একদিন সরসী দত্তের সাক্ষাৎ হয় তাদের কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে। কাহিনিতে যখন সুবিমল ও সরসীর আর্বিভাব হয়েছে তখন তাদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। একইভাবে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারেরও বর্ণণা আছে তার আবির্ভাবলগ্নে। তার বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারায় বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি চরণ, যেখানে বলা হয়েছে—"সুবিমলের চাইতে অনেক সুন্দর,অনেক স্বাস্থ্যবান।" এবং "এখনো বিয়ে করেননি,ফলে নানারকমের কানা ঘুষা মাঝে মাঝে কানে আসে।" অর্থাৎ প্রথম আর্বিভাবেই তাকে সুবিমলের সঙ্গে তুলনা করে ও চারিত্রিক অসংযমের ইঙ্গিত দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই গল্পে কাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক। ইনক্রিমেন্ট না পাওয়ার নালিশ জানাতে গিয়ে প্রথম সাক্ষাতের পর সরসী জেনারেল ম্যানেজার নবনী চ্যাটার্জীর ঘর থেকে বের হয়েছে হাসতে হাসতে। মাইনে বৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে তার যে আরও কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল কিছু দিনের মধ্যেই। এরপর থেকে সুবিমলের সঙ্গে সরসীর দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, আর একের পর এক প্রলোভন ও সুবিধা দানের দ্বারা নবনী চ্যাটার্জী গ্রাস করেছে সরসীকে। সরসীর চালচলনের সঙ্গে সঙ্গে তার পোষাক পরিচ্ছেদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ খোলের শাড়ির বদলে শোভা পেয়েছে দামি শাড়ি। হাত, কান ও গলার আভরণ-শূন্য স্থান গুলিও আর নিরাভরণ থাকেনি। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি, একটি বছর গড়াতে না গড়াতে সরসী ও নবনী চ্যাটার্জীর সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। সরসী দত্তকে যথাসাধ্য ব্যবহার করে নিয়ে নবনী পরিত্যাগ করেছে তাকে। নবনী চ্যাটার্জী বিবাহ করেছে অন্যত্র এবং সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে স্ত্রী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাপ্তির ভাণ্ডার। সরসী দত্ত চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সুবিমলও চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করেছে। সরসীর জন্য তার অন্তরে শুধু রয়ে গেছে, 'ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা'। কিন্তু

আপাতদৃষ্টিতে যার প্রতি সামান্য মমতা, সামান্য দুর্বলতাও অবশিষ্ট নেই বলে মনে হয়েছে, যার প্রতি সুবিমল সম্পূর্ণ নির্মম, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ বলে ভেবেছে নিজেকে, শেষ পর্যন্ত তার চিঠির আহ্বানে সুবিমল নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। নিজের মনে ভেবেছে এই সাড়া দেওয়া কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির প্রচেষ্টা মাত্র, কিন্তু তা কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার ছল মাত্র। সরসী যখন সুবিমলের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছে তখন সুবিমল চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং জানতে পেরেছে নবনী চ্যাটার্জী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সরসী দত্তকে দশহাজার টাকার ব্যাঙ্কচেক দিয়েছে এবং সরসী দত্ত সুবিমলের নামে সেই চেক এনডোর্স করে রেখেছে। প্রকৃত প্রেম ক্ষণস্থায়ী চটকের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত পথে যাত্রা করেছিল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ পথ হারাতে পারেনি। মোহভঙ্গ হবার পর, নিজেকে অসাধারণ রূপে সবার চোখে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নপূরণের পর সরসী তার প্রকৃত প্রেমকে খুঁজে পেয়েছে। অপরদিকে যে প্রেম সকল পার্থিব প্রাপ্তিকে অস্বীকার করতে পারে, প্রেমাস্পদের সমস্ত স্খলন, পতন, ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিতে পারে, মানুষের সাময়িক পদস্খলনের বিপরীতে তার সমগ্র সত্তার মহত্বকে চিনে নিতে পারে, সেই প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুবিমল নিজের হাতের মুঠোয় পাওয়া দশহাজার টাকাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। দশহাজার টাকার চেক ছিঁড়ে ফেলে সে যেন নিজে তার প্রেমাস্পদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে এবং তাকে গ্রহণও করেছে। এই গল্পের অবয়ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি একটি প্রচলিত ধারার প্রেমের গল্প, যেখানে প্রথম অংশে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ ও অনুরাগের কাহিনি বর্ণিত, মধ্যে খলনায়কের আর্বিভাব আর শেষাংশে রয়েছে খলনায়কের বিদায় ও নায়ক নায়িকার পুনর্মিলন। এই প্রচলিত ছকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটি দশহাজার টাকার চেক এবং এই চেকের ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বজয়ী প্রেমের মহিমাকে নরেন্দ্রনাথ রূপদান করতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের শ্রেণিতে 'চাঁদমিঞা' ও 'চেক' গল্প দুটি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে কেমন করে তিনি এই শ্রেণির গল্পে সর্বত্যাগী, সর্বংসহা ও সর্ববিজয়ী প্রেমের জয়গান রচনা করেছেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এমন প্রেমের গল্পও আছে যেখানে বাস্তবতার চাপে, বস্তুবাদীতার চাপে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে। এমনই দুটি গল্প হল—'চিলেকোঠা' ও 'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান', এই গল্প দুটিতে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে বলতে বোঝাতে চেয়েছি যে এই গল্পগুলিতে প্রেমাস্পদদের পারস্পরিক মিলন সম্ভব হয়নি এবং তার জন্য দায়ি বস্তুবাদীতা —অর্থাৎ হৃদয়ের উপর মস্তিষ্কের প্রাধান্য লাভ। কিন্তু তবুও এগুলি প্রেমের গল্প। লেখকের ভাষায়—" সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালবাসা। তবু তা ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"('গল্পলেখার গল্প')

প্রথমে 'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' গল্পটির আলোচনা করা যেতে পারে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭১ বঙ্গাব্দে, আনন্দবাজার পত্রিকার দোলসংখ্যায়। গল্পের নামকরণে 'নাগরিক'

শব্দটির উপস্থিতি এবং গল্পের নায়ক নায়িকার ভাবনাচিন্তার প্রবাহ তথা গল্পের পরিণতি ও লেখকের স্বরন্যাস (tone), গল্পে 'নাগরিক' শব্দটিকে ভিন্নমাত্রা প্রদান করেছে। গরিব বামুনের ছেলে সুরজিৎ ও ধনীর দুলালী বিপাশার দীর্ঘ আট বছরের প্রেম পরিণয়ের কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে পৌঁছায়নি। সুরজিৎ কলেজে চাকরি পেয়েছে বটে কিন্তু কোনোদিনই বিপাশার জন্মগত ভাবে লব্ধ আভিজাত্য, অর্থকৌলীন্য, রুচি ও সৌন্দর্যের সমগোত্র হতে পারেনি। তার অশিক্ষিত মা, অর্ধশিক্ষিত দিদিদের সংসারে বিপাশাকে বেমানান বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সেই সম্ভাবনাকে বিপাশা সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছে। কলেজে পড়বার সময় বহু ছেলে বন্ধুদের মধ্য থেকে সুরজিৎকে বিপাশা বেছে নিয়েছিল। তার কারণ ছিল সুরজিৎ-এর বিদ্যাবত্তা, সততা আর চরিত্রমাধুর্য। সুরজিৎ-এর আর্থিক অবস্থা, তার দারিদ্র্যের বিবরণ বিপাশার কাছে অজানা ছিলনা, কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তার আনুগত্যের কারণে সে চেয়েছে এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অস্বীকার করতে। সুরজিতের প্রতি তার আকর্ষণের অন্যতম কারণও ছিল এক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। লেখকের বিশ্লেষণ এই রকম — "সুরজিৎ লিখতে জানে না, গাইতে জানে না ,ছবি আঁকতে জানে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে জানে। আদর্শের স্বপ্ন সামাজিক বৈষম্য বিলোপের স্বপ্ন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের উত্থানের সহায়তার সঙ্কল্প। বিপাশা দেখেছে, সুরজিৎ শিল্পী নয়,কিন্তু বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহ দাউ দাউ করে জ্বলে না, দীপশিখার মত জ্বলে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বড় হয়েছে সুরজিৎ। দারিদ্র্যের অভিশাপের কথা সে জানে। তার অবসান চায়। বিপাশা দেখেছে, সুরজিৎ শিল্পী নয়, কিন্তু সৎ। তার সততাই এক শিল্প। তার চরিত্রই শিল্পগুণে ভূষিত। সেই চরিত্র একই সঙ্গে অনমনীয় আর মধুর। সুরজিৎ চঞ্চল নয়, প্রগলভ নয়, সংযত মিতভাষী দায়িত্ববান যুবক।"

বিপাশা দত্তের মত সুন্দরী ও ধনীর কন্যার স্বামী হবার জন্য যখন এই গুণগুলিও বিপাশার আত্মীয় পরিজন বা পিতামাতার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি, তখন বিপাশা যুক্তি দিয়েছে—"চেহারাই কি সব? অর্থই কি সব? গাড়ি-বাড়ির সুখই কি একমাত্র সুখ?" ফলে উচ্চপদস্থ অনেক চাকুরে, সুরজিৎ অপেক্ষা সামাজিক দিক থেকে অনেক উচ্চ শাখায় বসবাসকারী পাণিপ্রার্থীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বিপাশার কাছ থেকে। অপরদিকে সুরজিৎও নিজের আর্থিক, সামাজিক অবস্থানকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে বিপাশার কাছে। বিপাশা তার থেকে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় ছোট জেনেও বিপাশার —"রূপ ও লাবণ্যের কাছে, তার দেহাধারের অলৌকিক রহস্যের কাছে" সুরজিৎ নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিল আর এই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, তার কাছে মনে হয়েছিল—"যেমন দুঃসহ যন্ত্রণা তেমনি অপার্থিব অবিশ্বাস্য আনন্দ।" এই বিষামৃত সুরজিৎ দীর্ঘ আট বছর ধরে পান করেছে। কিন্তু এই প্রেমের উপাখ্যান খুব সাধারণ নয়, এ নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান। তাই নাগরিক জীবনের অন্যান্য

ক্ষেত্রের মতো এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে, হৃদয়বত্তা নয় বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাধান্য পেয়েছে সারল্য নয় বৈদগ্ধ, প্রেম নয় প্রয়োজন। তাই সুরজিৎ-এর বিদ্রোহী রূপ, সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কালের প্রবাহে আজ নির্বাপিত। সেও আজ আর সবার মত 'ক্যারিয়ারিস্ট', সংসারের পেষণে পীড়িত, উপার্জন বৃদ্ধির অতিপরিচিত পথের একজন সাধারণ পথিক। তাই— "এখন সুরজিতের বিশ্ব-বিপ্লব শুধু পরিজন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" নগর সভ্যতা তথা আধুনিক সভ্যতার চাপে সুরজিতের নিজের পরিবর্তন তার নিজের কাছে ধরা পড়েনি। বিপাশার সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব যে কেবল বিপাশার বাস্তববুদ্ধির অনিবার্য পরিণতি নয় তা সে বুঝতে পারেনি। তার মনে হয়েছে—" মেয়ে মাত্রেই বস্তুবাদিনী। বিশেষ করে এ যুগের মেয়ে। এই যান্ত্রিক যুগ যেন শুধু বস্তুতন্ত্রই জানে। তার আর কোন তন্ত্রমন্ত্র নেই।" দীর্ঘ আট বছর তারা একসঙ্গে বেড়িয়েছে,ঘুরেছে, তর্ক করেছে, আবৃত্তি করেছে, হাজার বাধা বিঘ্নতেও ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তাদের প্রেমের বন্যা আর আগের মত 'কুলপ্লাবিনী' নেই। তা এখন ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত; তাও স্বল্পসময়ের নদী। তাদের স্বপ্নের সৌধ যে আজ মাটির ধূলায় মিশে যাচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন— " বিপাশার স্বপ্নভঙ্গের হেতু একান্ত বস্তুগত। এই পৃথিবীর ধুলোমাটির মধ্যে প্রোথিত।" বিপাশা অভিজাত শ্রেণির উচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে পরিত্যাগ করে সুরজিতের মতন দরিদ্র পরিবারে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। সুরজিৎকে ভালবাসলেও তার অশিক্ষিতা মা অর্ধশিক্ষিতা দিদির সান্নিধ্যকে সে ভয় পায়। বিয়ের পর যেহেতু মেয়েদের পূর্বতন অভ্যাস, পরিবার সকল কিছুকে ছেড়ে চলে আসতে হয়, কিন্তু পুরুষকে তা করতে হয় না তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিবাহের ক্ষেত্রে বিপাশার দ্বিধাই বেশি। তাদের সম্পর্কের এই পরিণতি বিপাশা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। সুরজিৎ যখন তাদের ছোট ফ্ল্যাট দেখিয়ে বিপাশাকে বলেছে যে একটিমাত্র ঘরেই তাদের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে, তখন অন্তরে শিহরিত হয়ে উঠেও বিপাশা মনের কথাকে গোপন রেখে মিথ্যে করে সুরজিতের কাঙ্ক্ষিত উত্তর দিয়েছে। কিন্তু এই ছলনা ও আত্মপ্রতারণা দীর্ঘদিন চলেনি। একসময় তাদের সম্পর্কেরও ঘোষিত পরিসমাপ্তির সময় এসেছে। শেষ বিদায়ের বেলায় বিপাশা ধরা গলায় সুরজিতের কাঁধে মাথা রেখে অস্ফুট স্বরে সুরজিতকে অনুরোধ করেছে, সে যেন বিপাশাকে ভুল না বোঝে ; যেন সে তাকে অবিশ্বাস না করে। তাদের সম্পর্কের এই বিষাদময় পরিণতিতে সে দুঃখিত, ব্যথিত কিন্তু নিজের তুলনায় সুরজিতের অর্থ হীনতা, রুচির দীনতা, আর্থিক অবস্থার পার্থক্য, প্রকৃতগত অমিলকে অস্বীকার করে সে আর ফিরে আসতে পারে না। একসময় সহস্র বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে, কালের প্রবাহে এমন দিন এসেছে, যখন তাদের নিজেদের মধ্যেই দেখা দিয়েছে সহস্র বাধা ও বিরুদ্ধতা। এইভাবে দেখা যায় একটি দীর্ঘ দিনের প্রেম সম্পর্কের অবসান দেখিয়েছেন গল্পকার। সমস্ত ঘটনাটিই গল্পে টুকরো টুকরো অতীত ঝলকের

মধ্য দিয়ে বর্ণিত এবং শোয়িং অংশ অপেক্ষা চরিত্রদের স্মৃতি প্রবাহকেই গল্পকার গল্পের মূল আধার করেছেন। আর এই টুকরো টুকরো ঝলকের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সম্পূর্ণ চিত্র, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে নাগরিক সভ্যতায়, বস্তুতন্ত্রের চাপে একটি প্রেম সম্পর্কের অপমৃত্যুর ছবি। নাগরিক মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের চাপে আর বুদ্ধি, বৈদগ্ধ ও বাস্তববুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবার ফলে কেমন করে নিস্পাপ প্রেমের জগত থেকে নির্বাসিত হচ্ছে— তাই যেন লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রেমের এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাগরিক সভ্যতাকেই হেয় করেছেন লেখক আর তাঁর নিজের প্রেমচেতনাটি গল্পের নামকরণ থেকেই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এমনই এক প্রেমের অসফল পরিণতির গল্প'চিলেকোঠা'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭০ বঙ্গাব্দে, আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায়। এ গল্পে নায়ক নায়িকার মিলনে অন্যতম বাধা তাদের বয়সের পার্থক্য। নায়ক অমলেন্দুর বয়স চল্লিশ অথচ নায়িকা রীণা অষ্টাদশী। এছাড়া তাদের প্রেমের সম্পর্ক কেবলমাত্র উপলব্ধির স্তরেই আবদ্ধ, এই প্রেমের সরব ঘোষণা হয়নি কোন পক্ষ থেকেই। এই গল্পে প্রেমের সরব ঘোষণা নেই, স্বভাবতই প্রেমালাপও নেই এবং প্রেমের সফল পরিণতিও এখানে সম্ভব হয়নি, তবু এ গল্প প্রেমের গল্পই। গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী, উভয়েই উপলব্ধি করেছে পরস্পরের মানসিক অবস্থা, অনুভব করেছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু সেই আকর্ষণ তথা প্রেমকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। সাধারণভাবে এ বিষয়ে প্রেমের সরব ঘোষণার জন্য পুরুষ হবার কারণেই যে সদর্থক মানসিকতার প্রয়োজন ছিল অমলেন্দুর, তা সে সঞ্চয় করতে পারেনি। বারবার অগগ্রমনের পথে গেছে অমলেন্দু কিন্তু তার জীবনের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতই পশ্চাদপসরণই ঘটেছে বেশি। অমলেন্দু সৎ,বিনয়ী, ভদ্র এবং অবিবাহিত। চল্লিশ বছর বয়সেও এই কৌমার্য বরণ কিন্তু সংসারের প্রতি অনাসক্তিবশত নয় বরং নিজে মুক্ত জীবনের সাধনা করবার জন্য। অমলেন্দু ভেবেছিল —" গার্হস্থ্য সুখের চেয়ে তার পক্ষে অগৃহীর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ভালো, শান্তি ভালো, স্বস্তি ভালো।" তাই তার মা-এর মৃত্যুর পরেও সে ভেবেছে এবং অনুভব করেছে যে মা মুক্তি দিয়ে গেলেন—"সমস্ত বন্ধন মুক্তি ঘটে গেল।" এ একপ্রকার সংসার থেকে পলায়ন এবং প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত, তাই প্রকৃতিও এর শাস্তি দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করেছে যে, বন্ধনমুক্তি সহজ হয়না—"বন্ধন না থাকলেও একটি দুটি বন্ধনের তৃষ্ণাই যে সহস্র বন্ধনের বাড়া।" কিন্তু তবুও সে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়নি, জীবনযাত্রায় সঙ্গিনী হতে কাউকে আহ্বান করেনি। মুখ ফুটে তা করেনি বলেই তা থেকে যায় অন্তরে —" অস্ফুট আহ্বান মনের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।" তার মনে ক্ষীণ সাধ তবুও বজায় থেকেছে আর কারও আহ্বান পাবার জন্য। এই অস্ফুট আহ্বান মনের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবার গল্পই 'চিলেকোঠা'। যেখানে প্রেম, দুর্বলতার কারণে বাড়ির প্রধান ঘরে স্থান পায় না,

লুকিয়ে থাকে চিলেকোঠায়, যেখানে প্রেম হৃদয়ের গোপনে স্থান লাভ করলেও লুকিয়ে থাকে আরও হৃদয়াভ্যন্তরে চিলেকোঠায়।

কোলকাতা থেকে ২৪ পৌষ, ১৯৫৫ তারিখে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "আমার ভালো লাগে। আমার ভালো লাগে তোমাকে। কত কঠিন কত আয়াসসাধ্য এ কথা বলা। এ -কথাটি জানাতে কত আড়ম্বর সাজ-সজ্জারই না প্রয়োজন হয়। স্বর্ণের অলঙ্কার আর কাব্যের অলঙ্কারে মণ্ডিত করে তবে কথাটা তার কানে দেওয়া যায় যাকে আমার ভালো লাগে। শুধু এই কথাটা বলবার জন্য ধনী সংগ্রহ করেছেন হীরা আর মুক্তা, মণি আর মানিক্য; আর কবিরা গেঁথেছেন কথা আর কথা। তবু ক্ষোভ থেকে যায়, সংশয় থেকে যায় মনে, বলা হলো না, যা চেয়েছিলাম বলতে তার কিছুই যেন বলা হল না। সংশয় জাগে মনে, যাকে আমার ভালো লাগে তার কানে কথাটা ভালো করে পৌঁছল কিনা।"[৯]

— এমনই এক দ্বিধা দীর্ণ মানসিকতার শিকার যেন হয়েছে অমলেন্দু। এক্ষেত্রে সে প্রায় স্পষ্ট করেই বুঝেছে রীণার মন, রীণা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সামাজিক বাধা নিষেধকেও সে অমান্য করতে পারেনি। প্রেমে উদ্দাম হয়ে ওঠার যে বয়স, যে বয়সে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সব বাধাকে ভেঙে চুরমার করে প্রেম এগিয়ে যেতে পারে, সেই উদ্দামতার বয়স অমলেন্দুর নেই। সে চল্লিশ বছর বয়স্ক। দেহে ও মনে সে এখনও সতেজ, কিন্তু এক অষ্টাদশীকে চিরকাল সুখী করার মত ক্ষমতা তার আছে কি না, কিংবা ক'দিন পরেই যখন তার বার্দ্ধক্য আসবে তখন তাদের সম্পর্ক টিকবে কিনা—এ সকল বিষয়ে তার মনে প্রশ্ন আছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তার দ্বিধা দীর্ণ মানসিকতাকে উপলব্ধি করা যায় তার স্বগত ভাষণে — "অমলেন্দুর কি সেই ঐশ্বর্য আছে, সেই অপরিমিত খ্যাতি প্রতিপত্তি যাকে রীনা যৌবনের বিকল্প হিসাবে মনে করতে পারে ? যৌবনের কি সত্যই কোন বিকল্প আছে।"

প্রকৃতপক্ষে অমলেন্দু রীণার পিতামাতা বিনয়দা ও রেখা বউদির বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। যদিও তাদের বয়স তার থেকে অনেক বেশি। রীণার জন্মের সময়েও অমলেন্দু তাদের বন্ধু ছিলেন। এই রীণা যখন অষ্টাদশী হয়ে উঠতে চলেছে তখন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর এই পরিবারটির সঙ্গে অমলেন্দুর সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং পুনরায় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সময়েই দীর্ঘ দেড় বছর ধরে ক্রমাগত সান্নিধ্য লাভ ও বাক্ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অমলেন্দু ও রীণার মধ্যে, দুই অসমবয়সী নারী পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্র। গল্পকার অমলেন্দুর ভাবনা ও চিন্তনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই গল্পের অতি সামান্য কাহিনি অংশকে বর্ণনা করেছেন। অমলেন্দু দ্বিধায় পরিপূর্ণ কিন্তু রীণার প্রতি সে সুস্পষ্টভাবেই অনুরক্ত। রীণার কথাবার্তায় ও আচরণেও অমলেন্দুর প্রতি তার অনুরাগ গোপন

থাকেনি। কিন্তু মূল দ্বিধা অমলেন্দুর মনেই। সে রীণার মনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারার গর্ব অনুভব করেও নিঃসংশয় হতে পারেনি। কখনও তার মনে হয়েছে — "এই যে রীণার কিছু বলে না ডাকা, অমলেন্দুকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠা, আর সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা, বেড়ানো, বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে একেবারে সমবয়সী বন্ধু হয়ে যাওয়া — এসব কি একান্তই অর্থহীন ? এর মূলে কি আর কিছুই নেই? কিছুই আশা করবার মত নেই অমলেন্দুর ? নারী চরিত্র কি এতই দুর্জ্ঞেয়?" কিন্তু পরক্ষণেই সংশয় এসে গ্রাস করেছে তাকে — "..... একটি তরুণীর সাময়িক অবুঝ অনুরাগ আর সেই সর্বপ্লাবী, সর্বাত্মক প্রেম যে একার্থক তা অমলেন্দুকে কে বলল ?" অপরদিকে রীণা বারবার অপেক্ষা করেছে অমলেন্দুর দিক থেকে কোন সরব ও সুস্পষ্ট আহ্বানের। সে এই আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই আহ্বানের অভাবে হতাশ হয়েছে। অমলেন্দুর এই সাহসহীনতার কারণে হয়তো তার প্রতি রীণার যে মনোভাব জাগ্রত হয়েছে, তাতে মিশে আছে — ব্যঙ্গ, কৌতুক, উপহাস ও পরিহাস। কিন্তু অমলেন্দু যখন শেষ সুযোগ পেয়েও রীণাকে প্রেম নিবেদন করতে পারেনি তখনও অমলেন্দুর মনে হয়েছে এই ভালো হয়েছে। বিনয়দা ও রেখা বউদির বিশ্বাসভঙ্গ তাকে করতে হ'ল না, রীণার যথোপযুক্ত পাত্রে বিয়ে হবার পর রীণা হয়তো এই ভীরুতার জন্যই অমলেন্দুকে একদিন ধন্যবাদ দেবে। নিজের উদ্দাম কামনা বাসনাকে সে ঢেকে দিয়েছে প্রীতি, স্নেহ, ভালোবাসার মোড়কে। এ হয়তো পৌরুষের অভাব, ভীরুতা, কাপুরুষতা, এতে প্রেমের অমর্যাদা হয়, কিন্তু অমলেন্দু কেবল নিজের সুখের জন্য, এক স্নেহের- এক ভালবাসার পাত্রীর ভবিষ্যতের অনিশ্চিত জীবনকে বাজি রাখতে পারে না। কারণ জৈব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠা মানুষের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয়না। চল্লিশ বছরের অমলেন্দু যদিও দেহ মনে এখনও সতেজ কিন্তু অচিরেই জরা এসে তাকে আঁকড়ে ধরবে তখন রীণার মনে হয়তো অনুতাপ হবে এক অকৃতকার্য, অকিঞ্চিৎকর প্রৌঢ় পুরুষকে নিজের জীবনসঙ্গী চয়ন করবার জন্য। অমলেন্দু সৎ ও চিন্তাশীল তাই জীবনকে কেবল তাৎক্ষণিকতার মধ্য দিয়ে সে বিচার করতে পারেনি। অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে জীবনকে জুয়ো বা লটারি বলে মনে করতে পারেনি সে। অমলেন্দু জানে বিপুল খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থসম্পদের আড়ালেও যৌবনের অভাবকে লুকিয়ে রাখা যায় না। এইভাবেই অমলেন্দুর আপাত ভীরুতা ও কাপুরুষতার আড়ালে তার প্রকৃত প্রেমের প্রকাশটি হয়তো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু যখন, প্রকৃত প্রেম কেবল প্রেমাস্পদকে কাছেই টানেনা দূরেও ঠেলে দেয় – – এই বিশ্বাসটিকে ধরে রাখা যায় তখন প্রেমের সফল পরিণতিহীন এই গল্পটিও সফল প্রেমের গল্পই হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবন বাস্তবতার নানা জটিলতা ধরা পড়ে,কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর প্রেমচেতনায় ইতিবাচক দিকটি বার বার অনুভব করা যায়।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা ঃ

যে গল্পে রাজনৈতিক ঘটনা, কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে তাকে রাজনৈতিক গল্প বলা যেতে পারে। তবে গল্পে কেবল রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেই হবে না, গল্পের চরিত্রগুলিকেও হতে হবে রাজনৈতিক। সকল চরিত্রগুলি না হলেও অন্তত প্রধান চরিত্রগুলিকে হতেই হবে রাজনৈতিক, অর্থাৎ রাজনৈতিক কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ হবে এই চরিত্রগুলির চালিকা শক্তি। এই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাত অথবা এই মতাদর্শ চরিত্রদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত তথা নিয়ন্ত্রণ করে তাই সাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় রাজনৈতিক গল্পে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' বা মানুষের মনে অধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংগ্রামী চেতনার জাগরণের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত সমরেশ বসুর 'কিম্‌লিস' প্রভৃতি ছোটগল্প সার্থক রাজনৈতিক ছোটগল্পের উৎকৃষ্ট নির্দশন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসু যেভাবে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক ছোটগল্প রচনা করেছেন, নরেন্দ্রনাথের রচনায় সেই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োগসঞ্জাত ছোটগল্প আশা করা যায় না। এর কারণ নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা বা তার 'টেম্পারামেন্ট'। যদিও আলোচক জানান — "ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট -এ অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে তিনি প্রায়ই যেতেন। রাজনীতি ঘনিষ্ঠ 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল।"[১০] একই সঙ্গে আলোচক এও জানান — "কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতি তাঁকে কখনোই সেভাবে আকর্ষণ করেনি। ওইসব আড্ডায় যেতে প্রধানত আড্ডা দেবার মেজাজেই।"[১১]

একথা সত্য যে রাজনীতিকে জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে পারতেন না। সেই অর্থে রাজনৈতিক চরিত্রও তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে সৃষ্টি করেননি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থার প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন এবং রাজনীতিকে তিনি দেখতেন অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে। তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। তাঁর 'পতাকা' গল্পের প্রধান চরিত্র শচীবিলাসের চিন্তায় আসলে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই চিন্তা চেতনা, যেখানে তিনি লেখেন — "এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।" অতএব একথা বলাই যায় রাজনীতির সর্বগ্রাসীদিক ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্বয়কে তিনি পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। অপরদিকে রাজনীতিকে অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে যে তিনি দেখতেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি চিঠিতে।

২রা পোষ, ১৯৪৭ তারিখে শোভাবাজার থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—

"এই যে বেঁচে থাকা, খাওয়া, পরা, বাস করা নিয়ে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, নানা সমস্যার উদ্ভব, তার আলোচনাই রাজনীতি আর অর্থনীতি। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আগে রাজনীতি বলতে বুঝতুম রাজার নীতি। তখন রাজা ছিলেন সর্বপ্রধান। তিনি কীভাবে দেশ শাসন করেন, অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব না শত্রুতা কী রকম সম্পর্ক স্থাপন করেন, অন্যদেশ কীভাবে, কোন্ কৌশলে জয় করেন ইত্যাদিই ছিল রাজনীতি। এখনও দেশের শাসনতন্ত্র, বিদেশের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ ইত্যাদিই রাজনীতি (Polities) বলতে বোঝা যায়। অর্থনীতি (Economices ইকনমিকস) হ'ল কৃষি, শিল্প দেশের মধ্যে এবং বিদেশের সঙ্গে ব্যাবসা বাণিজ্য উৎপাদন ও বন্টন (মানে খাওয়া ও পরার জিনিস উৎপন্ন করা এবং দেশবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া) ইত্যাদির আলোচনা। এতেই বোঝা যায়, রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আজকালকার রাজনৈতিক সমস্যার সবই অর্থনৈতিক সমস্যা। এই যে যুদ্ধ বেঁধেছে, এর মূলে আছে অর্থনৈতিক কারণ। অনেক দেশ ইংরাজদের দখলে থাকায় সেইসব দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা, সেইসব দেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবার সুবিধা ইংরাজরা বেশি পায়, জার্মানরা তেমন পায় না, কিন্তু চায়। তাই এই যুদ্ধ। আমাদের দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, তাও এই খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধার অভাব দূর করবার জন্য।"[১২]

চিঠির এই অংশে তিনি রাজনীতি কী তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং যুদ্ধের কারণ সম্পর্কেও নিজের একটি মতামত দান করেছেন। এই চিঠিটিরই পরবর্তী অংশে তিনি সমাজ ব্যবস্থা - সমাজতন্ত্র, মূলধন, মালিক-ধনতন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই রচনা থেকেই নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার অন্তর্নিহিত রূপটি কিছুটা স্পষ্ট হয় এবং তাঁর বামপন্থী মানসিকতাটিও উপলব্ধি করা যায় — "একটি কথা লক্ষ্য করেছ বোধ হয় যে, সকলে সমাজবদ্ধ হয়েছে — সকলে যাতে মিলেমিশে খাওয়া-পরা-থাকার সুবিধা পায় সেইজন্য। সমাজের মূলে সকলের সহযোগিতা (Co-Operation), প্রতিযোগিতা (Competition) নয়। (যেমন বনের পশুকে তাড়াবার জন্য সকলে একসঙ্গে মিলেছে, একজন আর একজনের সঙ্গে পাল্লা দেয়নি।) কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করে দেখ। সকলেই কি খাওয়া, পরা, থাকার সুবিধা পাচ্ছে? একদল চরম সুখ-সুবিধা ভোগ করছে, আর এক দলের দিন কাটছে অর্ধ উপবাসে। অবশ্য এদের মধ্যে মাঝামাঝি একদলও আছে। এদের নাম মধ্যবিত্ত (Middle class)। একমুঠো চাল, কি একখানা কাপড় কিনবার মতো পয়সা একদলের নেই, আর বড় বড় বাড়ি, মোটর গাড়ি ইত্যাদি করেও বহু বাড়তি টাকা আর একদলের হাতে জমেছে। এই বাড়তি টাকার নাম Capital। যাদের এই টাকা আছে তাদের বলে capitalist। বর্তমান সমাজে এরাই প্রধান, এরাই

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে বর্তমান সমাজব্যবস্থার নাম হল Capitalism। বাংলায় এই তিনটি কথার নাম হ'ল যথাক্রমে, মূলধন, ধনী বা মালিক এবং ধনতন্ত্র।"[১৩]

অতএব দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ রাজনীতিকে অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত বলে মনে করতেন এবং এই ভাবনা ভ্রান্তও নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ দ্বারা চালিত হননি বা রাজনীতিকে তাঁর লেখনীর চালিকাশক্তি করে তোলেননি। কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। তাঁর গল্পের মধ্যেও তাঁর এই উপলব্ধিটির প্রকাশ ঘটেছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'অপঘাত' গল্পে বেলা স্বামী সুধীরকে বলেছে— "রাজনীতি ফিতি কি ছাই আমারই ভালো লাগে, না সত্যিই কিছু ওর বুঝি। কিন্তু না বুঝেও তো জো নেই, না ভেবেও তো পারিনে। চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কির করে। খাওয়ার সময় টের পাও না?" সুতরাং দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের মন মানসিকতার সঙ্গে রাজনীতি যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তিনি বর্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার সর্বগ্রাসী প্রভাব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। এখন তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করলে এই বিশেষ রাজনৈতিক চেতনাটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানসিকতা ছিল রোম্যান্টিক এবং তিনি তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন মানুষের গহন গভীর মনের রাজ্যের রহস্য উন্মোচনকে । তাই তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলিতেও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। তাঁর 'পতাকা' গল্পে রাজনৈতিক চরিত্র ও রাজনৈতিক পটভূমি বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও রাজনীতি "জীবননীতিকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।"[১৪] 'পতাকা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও সেই উদ্‌যাপনকে ঘিরে কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের বিরোধকে এই গল্পে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে ভিন্নমাত্রা দান করেছে পারিবারিক প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ২৬ শে জানুয়ারি তারিখটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ২৬ শে জানুয়ারি তারিখটিকেই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হত। এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ করেই একটি রাজনৈতিক পরিবারের মানসিক টানাপোড়েনকে লেখক আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

গল্পে দেখা যায় বৃদ্ধ শচীবিলাস কংগ্রেস পার্টির সক্রিয় সদস্য এবং দলে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। অপরদিকে তার মাতৃহারা কন্যা ইন্দিরা বামপন্থী ও বিপ্লববাদী। উভয়ের জীবনেই

রাজনীতি গভীর শিকড় প্রোথিত করেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় শচীবিলাস রাজনীতির কাজে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন, কখনো থেকেছেন অন্য জেলায়, কখনো বা জেলে। ইন্দিরাও তার পিতার থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র পথে। এহেন রাজনৈতিক পরিবারের রাজনৈতিক একটি চরিত্র শচীবিলাস নিজের গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামের শিল্পি নীলকমল পালকে দিয়ে একখণ্ড সাদা ধবধবে খদ্দরের কাপড়ে চরকা ও হরিৎ হলুদের ঢেউ অঙ্কন করিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন পতাকা। গগন ঘরামিকে দিয়ে বাঁশ কাটিয়ে প্রস্তুত করেছেন পতাকা দণ্ড । সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে করবার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী, সহযোগী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সারাদিনের অনুষ্ঠানসূচী স্থির করেছেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য করণীয় সকল কিছু সম্পন্ন করেছেন। নিজের পরিকল্পনায় শচীবিলাসের নিজেরই বুক ভরে গিয়েছে, একই সঙ্গে হৃদয়ে জেগেছে গর্ব ও আনন্দের অনুভূতি। অপরদিকে মেয়ে ইন্দিরার সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধিতাতে তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করেছেন। এক সঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিরোধ ও তর্ক-বিতর্ক বেধে যায়, পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। পিতা ও কন্যার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়; রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রভেদ বড় হয়ে ওঠে। পিতার প্রতি ইন্দিরার যাবতীয় কর্তব্য পালন সত্ত্বেও শচীবিলাসের মনে হয় —"ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়, তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে?" এরপর এই দূরত্বের কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন — "রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।" গল্পের সূচনায় পিতাপুত্রীর এই সম্পর্কের সংকট পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিতে গল্পে বাহ্যিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তারও পূর্বে শচীবিলাস ও ইন্দিরার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা গল্পের অন্তরঙ্গ বিরোধকে জন্ম দিয়েছে। এই বিরোধে শচীবিলাস আত্মভাষণে নিজের পক্ষাবলম্বন করেছেন — "রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিস্কে নয়, জ্ঞানমাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয় ধর্ম। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে।" কিন্তু শচীবিলাসের এই উপলব্ধি ও ভাবনাকে ইন্দিরা মান্য করেনা, শ্রদ্ধাও করেনা। সে ভিন্নতর রাজনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করে এবং পিতার রাজনীতি নামে ধর্মপালনকে, বিশেষত পৌত্তলিক ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে। বলে—

রাজনীতি গভীর শিকড় প্রোথিত করেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় শচীবিলাস রাজনীতির কাজে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন, কখনো থেকেছেন অন্য জেলায়, কখনো বা জেলে। ইন্দিরাও তার পিতার থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র পথে। এহেন রাজনৈতিক পরিবারের রাজনৈতিক একটি চরিত্র শচীবিলাস নিজের গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামের শিল্পি নীলকমল পালকে দিয়ে একখণ্ড সাদা ধবধবে খদ্দরের কাপড়ে চরকা ও হরিৎ হলুদের ঢেউ অঙ্কন করিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন পতাকা। গগন ঘরামিকে দিয়ে বাঁশ কাটিয়ে প্রস্তুত করেছেন পতাকা দণ্ড । সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে করবার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী, সহযোগী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সারাদিনের অনুষ্ঠানসূচী স্থির করেছেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য করণীয় সকল কিছু সম্পন্ন করেছেন। নিজের পরিকল্পনায় শচীবিলাসের নিজেরই বুক ভরে গিয়েছে, একই সঙ্গে হৃদয়ে জেগেছে গর্ব ও আনন্দের অনুভূতি। অপরদিকে মেয়ে ইন্দিরার সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধিতাতে তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করেছেন। এক সঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিরোধ ও তর্ক-বিতর্ক বেধে যায়, পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। পিতা ও কন্যার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়; রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রভেদ বড় হয়ে ওঠে। পিতার প্রতি ইন্দিরার যাবতীয় কর্তব্য পালন সত্ত্বেও শচীবিলাসের মনে হয় —"ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়, তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে?" এরপর এই দূরত্বের কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন — "রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।" গল্পের সূচনায় পিতাপুত্রীর এই সম্পর্কের সংকট পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিতে গল্পে বাহ্যিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তারও পূর্বে শচীবিলাস ও ইন্দিরার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা গল্পের অন্তরঙ্গ বিরোধকে জন্ম দিয়েছে। এই বিরোধে শচীবিলাস আত্মভাষণে নিজের পক্ষাবলম্বন করেছেন — "রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিস্কে নয়, জ্ঞানমাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয় ধর্ম। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে।" কিন্তু শচীবিলাসের এই উপলব্ধি ও ভাবনাকে ইন্দিরা মান্য করেনা, শ্রদ্ধাও করেনা। সে ভিন্নতর রাজনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করে এবং পিতার রাজনীতি নামে ধর্মপালনকে, বিশেষত পৌত্তলিক ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে। বলে—

"এক হিসাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন তাদের ইচ্ছামত ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।" রাজনৈতিক মতাদর্শগত এই ভিন্নতা পিতা ও কন্যার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ককে বিনষ্ট করেছে। পিতার প্রতি কন্যার আবদার, অভিমানের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রয়ে গেছে শুধু শ্লেষ আর ব্যঙ্গের ভাষা।

সর্বগ্রাসী রাজনীতির দুরতিক্রম্য প্রভাব যে কেবল পিতা ও কন্যার পারস্পরিক সম্পর্ককে স্পর্শ করে তাই নয়, এই রাজনীতি যে "তরুণ তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।"— তারও ইঙ্গিত আছে গল্পে। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরার প্রণয়ী নিরুপমের উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের অতি সামান্য পার্থক্যও ইন্দিরা ও নিরুপম সহ্য করতে পারেনি। পরস্পর পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে। যদিও উভয়েই ছিল বামপন্থী এবং উভয়েই বিপ্লববাদী। অতএব দেখা যায় এই 'পতাকা' গল্পের সূচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শ কী ভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, তার সুকুমার বৃত্তিকে বিনষ্ট করে বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বিনষ্ট করে তার পরিচয় রয়েছে আর রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের দর্পিত বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিবৃত্ত। তাই ইন্দিরার পিসি বয়স্থা চারুবালার মনে হয়েছে— "আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আর চুল বাঁধত, আর একালের মেয়েরা তার বদলে না হয় রাঁধে আর দল বাঁধে।"

এই মতাদর্শগত বিরোধের ছায়ায় পারিবারিক সম্পর্কের বিনষ্টির চিত্রই গল্পের মূল উপজীব্য নয়। পরিবারের এই অন্তর্নিহিত বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাহ্যিক বিরোধিতা। শচীবিলাসের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে পাথরপ্রতিম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়। হিন্দু মুসলমানের এক কালের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের স্থান নিয়েছে হিংসা, দ্বেষ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস। এতদিন যে জমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে সে স্থানে আর পতাকা উত্তোলন করতে দেবে না মুসলমানেরা। তে-রঙা চরকা অঙ্কিত পতাকা মুসলমানেরা নিজেদের বলে মানতে চায়নি। তাদের মতে, "..... ও নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ- মার্কা লীগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুনাহ্ হয়। ও নিশান এখানে আমরা উড়াতে দিতে পারি না।"

এই সমবেত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে দূর করবার প্রচেষ্টা করেছেন শচীবিলাস প্রাণপণে। বোঝাতে চেয়েছেন এই নিশান কেবল হিন্দুর নয়, এই নিশান হিন্দু মুসলমান সকলেরই। এই নিশান ভারতের জাতীয় পতাকা। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে হিন্দুরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য এককাট্টা হয়েছে। ফলে উত্তেজনার পারদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের

পথ অসম্ভব বলে মনে হয়েছে প্রবীণ শচীবিলাসের। তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। বহুবার এই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন, পুলিশের মারে রক্তাক্ত হয়েছেন, কিন্তু এমন বাধা কোনোদিন পাননি। এ বাধা আইনের নয়, পুলিশের নয়, যারা বিরুদ্ধতা করছে তারা একটি শ্রেণি — "তারা দু'চার দশ জন নয়, দু'চার হাজারও নয়, অনেক অনেক বেশি। তারা পর নয়, নিতান্ত আপনার জন; তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে ফেলে যায় না, রাগে অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা যায়না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গের তারা প্রত্যঙ্গ।" দেশের এই অবিচ্ছেদ্য অংশরাই আজ জাতীয় পতাকার অমর্যাদা করতে উদ্যত এবং এই পরিস্থিতি শচীবিলাসের কাছে হয়ে উঠেছে মর্মন্তুদ ও যন্ত্রণাদায়ক। ফলে তিনি নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ অবস্থায় ইন্দিরা মুসলনমানদের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে এ সংকটের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করেছে। সমাধানটি হল এই যে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনো নিশানই উত্তোলিত হবে না, কোনো প্রতীকের প্রয়োজন নেই এবং তাতে সকলে যোগ দেবে। এই সমাধান অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। প্রতীকহীন অনাড়ম্বর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের এই প্রস্তাবকে শচীবিলাস বেদনাতুর হৃদয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু এই দিবস উদ্‌যাপনের উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পরিণামে গভীর প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। তার অন্তরের সকল ক্ষোভ ও বেদনা দূর হয়ে গেছে। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে, কন্যার সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে তার যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, জাতীয় পতাকার উত্তোলন বিষয়ে সেই কন্যার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে তিনি যেন হারানো কন্যাকে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন। তিনি কেবল সন্তানবাৎসল্যের কাছে পরাস্ত হননি, স্বজনবাৎসল্যের কাছেও নিজের কঠোর রাজনৈতিক আদর্শকে একটু নমনীয় করে তুলেছেন। ফলে যে শ্রেণি এতক্ষণ সমবেতভাবে বিরুদ্ধতা করেছিল, তাদেরও তিনি এক ছাতার নিচে মেলাতে পেরেছেন। যে রাজনৈতিক আদর্শগত অনৈক্য পিতা ও কন্যার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছিল তা দূর হয়ে গিয়ে প্রফুল্ল আনন্দময় পরিস্থিতির সঞ্চার হয়েছে। রাজনীতির কারণে মন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছিল আর পরিণামে মনের পরিবর্তনে রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে। শচীবিলাসের এই উপলব্ধির পরিবর্তনের ইঙ্গিত লেখক পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন — "রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।"

এইভাবে 'পতাকা' গল্পে রাজনৈতিক সংঘাতের ছবি অঙ্কন করেছেন লেখক, আবার একই সঙ্গে পারিবারিক বিরোধের পটভূমিতে এই সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার এই সংঘাতের সমাধানের উপায় করে দিয়েছেন এই রাজনীতির মধ্য দিয়েই। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এই গল্পের চরিত্রগুলি রাজনৈতিক, গল্পের মূল সংকট ঘনীভূত হয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে

মানবাত্মা, পিতার স্নেহশীলতা জয়ী হয়েছে, জয়ী হয়েছে শ্রেণিগত ও আদর্শগত ভিন্নতার উপর বাৎসল্য আর এই বিষয় গুলি সবই অরাজনৈতিক।

'পতাকা' গল্পটিকে চরিত্র ও ঘটনাগত দিক থেকে যে অর্থে রাজনৈতিক গল্প বলা যায় 'শোক' গল্পটি ঠিক সেই অর্থে রাজনৈতিক নয়। কিন্তু এ গল্পের অনেকখানি স্থান জুড়ে অবশ্যই আছে রাজনীতি। 'শোক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের গণ- আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিধৃত। তবে নরেন্দ্রনাথের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ গল্পেও প্রাধান্য পেয়েছে মানবের গভীর অন্তর্লোক, যেখানকার শোক, দুঃখ, বেদনা ও অভিমানের চিত্র অঙ্কনে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ সিদ্ধি। প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও লেখক হিসেবে গড়ে উঠবার দেশকালের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ভারতের গণ- আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রকমই এক সংঘর্ষে গল্পের প্রধান চরিত্র মল্লিকার স্বামী শশধরের মৃত্যু হয়েছে। তবে এই শশধর বিপ্লবী বা স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতিনিধি নয়। সে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের একনিষ্ঠ কর্মচারী — থানার দারোগা। উপরওয়ালার হুকুমে সে কালীবাড়ির মাঠে আয়োজিত ইংরেজ সরকার- বিরোধী সমাবেশকে ভেঙে দিতে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। উন্মত্ত জনতা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ এই সরকারী কর্মচারীকে তাদের শত্রু গণ্য করেছে এবং জনরোষ তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি — "মাঠশুদ্ধ লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। ভয়ে পালিয়ে এসেছে তার দলবল কনস্টেবলেরা। একটি লোককে মারবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক না এনেছিল হেন অস্ত্র নেই। ইট, লাঠি, সোডার বোতল, সব কিছুর আঘাতই শশধরের মাথায় মুখে পিঠে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কানের পিঠ থেকে কাতলা মাছের রক্তের মত কয়েক ঘন্টা অবিরল রক্ত ঝরেছিল শশধরের।"

স্বামীর মৃত্যুতে মল্লিকা শোকে পাথর হয়ে গেছে, তার নিরালম্ব জীবনের একমাত্র সঙ্গী হয়েছে শশধরের স্মৃতি। অপরদিকে বিশ্বস্ত কর্মচারীর মৃত্যু সরকার সহজে ভোলেনি, সহ্যও করেনি। সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য সাড়া শহরকে ঘিরে ফেলে শহরের সমস্ত দোকানপাটের দ্রব্যসামগ্রী ছড়িয়ে ফেলেছে রাস্তায় ধুলোয়। অশিক্ষিত গুন্ডা বদমাসদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল লুটপাটের জন্য। শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের স্ত্রী কন্যারাও একবস্ত্রে মান নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গহনাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের সম্ভ্রমও নষ্ট হয়েছে। লেখকের বর্ণনা এইরকম — "স্কুলের হেডমাস্টার আর ইতিহাসের মাস্টারকে দু'দিন দু'রাত অনাহারে আটকে রাখা হয়েছিল থানায়। শহরের অধিকাংশ যুবকদের নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যার অপরাধে চালান দেওয়া হয়েছিল সদরে।" এইভাবে মল্লিকার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মল্লিকার শোক তাতেও শান্তি পায়নি। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে স্বামীহারা হয়ে মল্লিকার মনে

হয়েছে এই গোটা শহরকে ভেঙে গুড়িয়ে যদি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেত তবে তার প্রাণে শান্তি হ'ত।

কিন্তু মল্লিকার স্বামীর প্রতি সহানুভূতি সকলের নেই। অধিকাংশ মানুষ মনে করে শশধর উচিত শিক্ষা পেয়েছে। শশধর ছিল দেশের শত্রু, স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা — এইসব নানারকম নিন্দাবাদ ও ধিক্কারের কথাও কানে আসে মল্লিকার। এছাড়া শশধরকে খুন করবার অপরাধে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেনি। দেশের সকলের সহানুভূতি ছিল আন্দোলনকারীদের পক্ষে। কলকাতার বড় বড় ব্যারিস্টার আসামীদের পক্ষ হয়ে আদালতে কেস লড়েছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকার যোগার করতে পারেনি। কয়েকজনের মাত্র ছ'মাস, এক'বছরের জেল হয়েছে। কেবল প্রবীণ বিপ্লবী সুরেশ্বর চৌধুরী জেল খাটছেন। এই একজন ব্যক্তির কঠোর শাস্তিতে মল্লিকা কিছুটা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছে। যেন কিছুটা প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মাধ্যমে শান্তির আশ্বাস লাভের চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু সমগ্র শহরবাসীর সমবেদনা ও সহানুভূতি সুরেশ্বরবাবু লাভ করেছেন। সকলেই মনে করেন যে পুলিশ সুরেশ্বরবাবুকে মিথ্যে ফাঁসিয়েছে। পুরোনো আক্রোশে তার 'ঘাড়ে সব অপরাধ চাপিয়েছে'। শশধরের করুণ মৃত্যুর পরও শশধর মানুষের ন্যূনতম সহানুভূতি অর্জনে অসমর্থ হয়েছে।

শশধরের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিন শশধরের স্মৃতিকে বুকে চেপে সকল প্রকার সামাজিক কর্তব্য মল্লিকা পালন করেছে এবং শশধরের ফটোতে মালা দেবার জন্য মালা গাঁথতে বসেছে। এমন সময়ে সে জানতে পেরেছে সুরেশ্বর বাবুকে সেদিনই জেল হাজত থেকে অসুস্থতার কারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শহরের সকলের সমবেত জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে রুগ্ন, শীর্ণ, অশক্ত সুরেশ্বর বাবুকে নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে রাস্তা দিয়ে। মল্লিকা তখন আবিস্কার করে, তার পিতামাতা কন্যার শোকের সমব্যথী হলেও, তাদের হৃদয়ে সুরেশ্বর বাবুর স্থান অনেক উপরে। কন্যার স্বামীকে হত্যার দায়ে যে ব্যক্তি জেল খাটছেন, সেই ব্যক্তির প্রতি তারা অন্তরঙ্গতা অনুভব না করে থাকতে পারেননি। সুরেশ্বরবাবুর মুক্তির খবর তারা সবাই জানতেন কিন্তু কেবল মল্লিকার কাছ থেকে সযত্নে সেই সংবাদটি তারা গোপন রেখেছেন। মল্লিকা যখন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন তিনি এই বিশেষ দিনটিতেই যে সুরেশ্বরবাবুও মুক্তি পাবার কথা তা কন্যার কাছে গোপন রেখেছেন, তখন বিপিনবাবু একটু অপরাধীর সুরেই বলেছেন যে, তিনি এ খবর নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তবে এই সঙ্গে তিনি আরও বলেন — "কিন্তু শরীর একেবারে ভেঙে পড়ায় গভর্নমেন্ট আগেই ছেড়ে দিয়েছে। শুনেছি কিছুই নাকি নেই আর দেহের। একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। যে কোন দিনই হয়ে যেতে পারে। গভর্নমেন্ট সেই জন্যই আর রাখতে সাহস পাননি।" — এই কথা বলার সময় বিপিনবাবুর কণ্ঠ সুরেশ্বরবাবুর জন্য বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। এরপর ঘটেছে মল্লিকার পক্ষে আরও হৃদয় বিদারক ঘটনা, যখন শশধরের মালা গাঁথার জন্য যে ফুল মল্লিকা সংগ্রহ করেছিল

সেগুলি মল্লিকার ছোটবোন অতসী আঁচলে তুলে নিয়ে গেছে এবং সুরেশ্বরবাবুর গলায় সেই ফুলের মালা পড়াবার জন্য ছুটে গিয়েছে। ছোট্ট অতসীও দেশব্যাপী স্বাধীনতা লাভের উন্মাদনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। মল্লিকা তার ফুল নিয়ে নেওয়া থেকে অতসীকে বাধা দিয়েছে কিন্তু অতসীকে দমানো যায়নি। মল্লিকা লক্ষ করেছে অতসীর এই কাজে তার বাবা বিপিনবাবু ধমক দিচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ধমকে জোর নেই বরং রয়েছে প্রশ্রয়ের সুর। তখন মল্লিকা অনুভব করেছে যে সে একা হয়ে গেছে। শশধরের জন্য শোক কেবল তার একার, তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য মানুষের শুভকামনা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এ সবের মাঝে তার মৃত স্বামী শশধরের কোনো স্থান নেই এবং তার নিজেরও স্থান নেই। তখন তার অনুভব হয়েছে শশধরের অসম্পূর্ণতা। যখন দেশের সকলে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করতে একত্রিত হয়েছে, বৃহত্তর জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন শশধর ব্রিটিশ সরকারের অনুগত পুলিশ কর্মচারী হিসেবে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে সে দেশের সকল লোকের চোখে পরিণত হয়েছে দেশের শত্রুতে এবং সকলের নজরে নীচে নেমে গেছে। এই সত্য উপলব্ধিতে মল্লিকা অনুভব করেছে, শশধরের যে চাকুরির জন্য সে অন্তরে গর্ব অনুভব করতো, তার সেই গর্বের বস্তুটি আজ হয়ে উঠেছে তার চরম লজ্জা ও অপমানের স্থান। শশধরের এই দেশদ্রোহীতার জন্য সেও দুঃখিত হয়েছে এবং মৃত স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনুযোগ করেছে, কেন শশধর সুরেশ্বরবাবুর মত দেশপ্রেমিক হ'ল না, কেন এমন হীনতার মৃত্যু তাকে গ্রহণ করতে হল। যদি শশধর দেশপ্রেমিক হ'ত তবে তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাকেও অপমানিত হ'তে হ'ত না। মল্লিকা তাই কেঁদে বলেছে — "ওগো তোমার ফুলের মালা কি অতসী তাহলে অমন করে কেড়ে নিতে পারত?" অতএব দেখা যায় যে, মল্লিকার হৃদ্‌গত অনুভূতি ও সত্যোপলব্ধির যন্ত্রণায় গল্পের পরিসমাপ্তি কিন্তু যেহেতু গল্পের মূল সংকট রাজনীতির সঙ্গে অন্বিত, তাই এ গল্প মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ সহযোগেও রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ছোটগল্পের ধারায় আর একটি বিশিষ্ট গল্প হ'ল 'অপঘাত'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। গল্পটি এই কারণে বিশিষ্ট যে, একটি অতি সাধারণ গৃহবধূ কেমন ক'রে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে শেষ পর্যন্ত প্রাণদান করল — তারই ইতিবৃত্ত 'অপঘাত' গল্পের মূল উপজীব্য। নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই, নারীরা যে সাবলম্বী হয়ে উঠছে, পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে ও সমানতালে বাইরের কাজ করছে, বহুদিনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে গৃহের বাইরের পথে পা বাড়িয়েছে, এমন চিত্র আমরা পেয়েছি। 'অপঘাত' গল্পে নারীর এই স্বাধীন চিত্ততার ও কর্মপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সচেতনতা। বাংলাদেশের প্রচলিত চিত্র এই যে, প্রাক্ বিবাহ পর্বে পিতা এবং বিবাহ পরবর্তীতে স্বামীর রাজনৈতিক মতাদর্শকে মেয়েরা

অন্ধভাবে অনুসরণ বা সমর্থন ক'রে থাকে। কিন্তু এই গল্পে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ এবং প্রায় অশিক্ষিত গৃহবধূ পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং সেই মতাদর্শকে অন্তরে ও বাহ্যিক আচরণে গ্রহণ করেছে। এই গৃহবধূ বেলার স্বামী সুধীর রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে না বরং বেলাকে তার রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যঙ্গ করে বলে, 'রাজনীতি রঙ্গিনী'। কিন্তু এই ব্যঙ্গ বেলা গায়ে মাখেনা বরং এই রাজনীতির মধ্যে নিজের প্রাণের মুক্তি খুঁজে পায়, কারণ সে নিজেও 'রাজনীতি-ফিতি' বোঝে না, কিন্তু, "সবাই মিলে ভালো খেতে চাই, পরতে চাই, লেখাপড়া শিখতে চাই, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাই" — বেলা এই প্রার্থনা করে । যেহেতু এই আপাত সহজ কথাগুলি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাই তার প্রভাব এড়াতে পারেনা বেলা। রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবকেও তাই সে স্বীকার করে নেয়, এবং স্বামীর কাছে রাজনীতির এই ব্যাপ্তির কথা ঘোষণা করে বলে — "চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কির করে। খাওয়ার সময় টের পাওনা।" বেলার কাছে রাজনীতির অর্থ "রাজার নীতি" নয়, বরং ভালোভাবে বাঁচার শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্র। তাই যখন সুধীর তাকে ঘর সংসারে মন দেবার কথা বলেছে, তখন সে বলে, রাজনীতি সে করেনা, রাজা মন্ত্রী যুদ্ধ বিগ্রহের ধার সে ধারেনা বরং— "সমিতির মেয়েদের অসুখ বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করি, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি। যাদের সংসার চলে না তাদের সেলাইর কাজ যোগাই।"

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় বেলা যে কেবল বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছে তাই নয়, নিজের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, দেশ ও দশের সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে এবং অন্যকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। একজন সাধারণ গৃহবধূকে এই রাজনীতির অঙ্গনে যে নিয়ে এসেছে সেও একজন মহিলা — "লম্বা কালো মত চশমা পরা উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে" — তার নাম শুক্তি রায়। এই শুক্তি রায় বেলাকে রাজনীতির অঙ্গনে মুক্তি দিয়েছে এবং মহিলা সমিতিতে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেছে। যখন প্রথমে বেলা এই সমিতিতে যোগদান না করবার জন্য যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে, সে ঝাড়া হাত পা নয়, তার ঘর সংসার স্বামী পুত্র পরিজন রয়েছে ও তাদের প্রতি তার কর্তব্যও রয়েছে। এর উত্তরে শুক্তি রায় বিপরীত যুক্তি দিয়ে বলেছে — "..... সেই সঙ্গে তোমার আরো একটি নতুন জিনিস হবে — সমিতি। দেখবে তার সঙ্গেও তোমার এক নতুন আত্মীয়তা। ঠিক রক্তের সম্পর্ক নয়, আর এক ধরনের সম্পর্ক, কিন্তু তার মধ্যেও রস কম নেই, রঙ কম নেই, সে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককে আরো জোরালো করে, আরো মধুর করে।" সে আরও বলেছে যে, এই সমিতি করার ফলে বেলার সংসার ভেসে যাবে না, সংসারের ক্ষতি হবে না বরং আরও সুদৃঢ় হবে আরও সমৃদ্ধ হবে — "সংসারকে ভালো করে বাঁচাবার জন্যই তো এই সব সমিতি। এতো ভাই সন্ন্যাসীদের মঠ নয়, যে সংসারের সঙ্গে এর কোন

সম্পর্ক থাকবে না, আমাদের মঠ সংসারের জন্যই। ঘর গৃহস্থালীকে আরো আঁটসাঁট মজবুত করে বাঁধবার জন্যই আমরা এই সন্ন্যাস নিয়েছি।" অতএব দেখা যায় 'পতাকা' গল্পের রাজনৈতিক চরিত্র ইন্দিরার সঙ্গে 'অপঘাত' গল্পের বেলাদেবীর মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। ইন্দিরা রাজনীতির কারণে প্রায় সন্ন্যাসিনী। সে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকে। সংসার বা পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাতের সময় সে পায়না এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শগত সূক্ষ্ম ভিন্নতার কারণে নিজের প্রেম জীবনকেও নিজ হাতে সে বিনষ্ট করেছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পের বেলা রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গে অন্বিত করেছে। তার রাজনীতি জীবন সংরক্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাধারণ নারী চরিত্রের গন্ডিবদ্ধ জীবনকে অস্বীকারের মহিমায় উজ্জ্বল। রাজনীতির হাতধরে বেলা নিজের পরিচিত ছকেবাঁধা জীবনের ছককে ভেঙে বেড়িয়ে এসেছে এবং নিজের জীবনকে ভিন্ন এক মাত্রা প্রদান করেছে। যখন বেলার জীবন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে তখনই ঘটেছে এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দেশব্যাপী দেখা দিল অর্ধাহার, অনাহার। লেখক স্বল্পপরিসরে বর্ণনা করেছেন সেই দুঃসময়ের দিনগুলিকে — "কিন্তু দেখতে দেখতে সেই কাঁকরওয়ালা চালও এ অঞ্চলে দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠল। চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেল তার মণ। টাকাতেও মেলেনা এমন হল অবস্থা। ..... ঘরে ঘরে অর্ধাহার, স্বল্পাহার শুরু হল। শহরতলীর সমাজের তলাকার বাসিন্দাদের দু'একবেলা অনাহারে চলতে লাগল।" সরকার থেকে ঘোষণা করা হল যে এই অনটন বা অভাব দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। খুব শীঘ্র দূরদেশ থেকে জাহাজে চাল আসছে — এই অবস্থার সুরাহা হবে খুব শিগগিরি। কিন্তু খবর যত শীঘ্র এল আহার এল তত দেরিতে। ফলে সমগ্রদেশ চঞ্চল হয়ে উঠল, খাদ্যের দাবীতে মানুষ উত্তাল হয়ে উঠল। ভুখা মিছিল বার করে সবাই মহকুমা হাকিমের আদালতে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবার কথা স্থির করল। অপরদিকে গোলমালের আশংকায় সরকার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে। সকল প্রকার সভা সমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে বেলা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একদিন যে ভাবত কেবল নিজেকে নিয়ে, নিজের পরিবারকে নিয়ে, কিন্তু নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বেলা ভেবেছে সমগ্র দেশকে নিয়ে। নিছক ব্যক্তিগত দান-দক্ষিণা সমগ্র দেশব্যাপী এই ক্ষুধার রাজত্বকে দূর করতে পারবে না তা সে উপলব্ধি করেছে। তাই সে নিজের সাধ্যমত অন্যের ক্ষিদে মেটানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু এও উপলব্ধি করেছে যে, তার এই উদ্যোগ সকল মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবেনা । সে কেবল ক্ষুদ্র অংশে তার দৃষ্টিকে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর ক্ষেত্রের কথা ভাবতে চেয়েছে; বলেছে — "একি শুধু দান খয়রাতের ব্যাপার। দান খয়রাতে কি সকলের অভাব মিটবে।" সুধীর নিজের পরিবারের জন্য কিছু চাল সংগ্রহ ক'রে এনেছে, কিন্তু কেবল নিজের পরিবারের অন্ন সংস্থানই বেলার একমাত্র অন্বিষ্ট নয়। সে চায় সকলের ক্ষুধার নিবৃত্তি। তাই তার অন্তরের দাহ শান্ত হয়নি। বেলার এই মানসিকতাকে উপলব্ধি করেছে সুধীর, কিন্তু তাকে শান্ত করতে পারেনি। তাই লেখক

বলেন — " .. বেলা যে জ্বালার কথা বলেছে তা তো শুধু তার নিজের আর ছেলেপুলেদের পেটের জ্বালা নয়, সে জ্বালা মিটায় সাধ্য কি সুধীরের।" বেলা দেশব্যাপী অনাহারের অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে, ভিক্ষে করে যাঞ্চা করে খাদ্য সংগ্রহ করতে চায়নি বরং সদম্ভে ঘোষণা করেছে — "জোর করে দাবী জানাব, জোর করে আদায় করে আনব চাল।" এই বলে বেলা প্রতিবাদ মিছিলে যোগদান করেছে, কেবল নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি বরং দেশশুদ্ধ সকলের জন্য অন্ন সংগ্রহের সংগ্রামে নেমেছে এবং পরিণামে পুলিশের নির্বিচার লাঠির ঘায়ে আত্ম-বলিদানে শহীদ হয়েছে।

এইভাবে 'অপঘাত' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে দৃষ্টির প্রসারতা ঘটে। সর্বগ্রাসী রাজনীতির প্রভাব কেমন ক'রে এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহবধূকেও বিশ্বের বৃহত্তর অঙ্গনে মুক্তি দিয়েছে, কেমন ক'রে এক ভিন্নমাত্রা ও ভিন্ন উচ্চতা দান করেছে তা যথার্থ শিল্পমণ্ডিতভাবে লেখক এই গল্পে প্রকাশ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রবণতাই ছিল মানুষের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রতি, বিশেষত তাঁর রোম্যাটিক মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় দানের দিকে। রাজনীতি তাঁর অন্বিষ্ট বিষয় কোনদিনই নয়। যদিও রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতকে নিয়ে তিনি গল্প রচনা করেছেন। কিন্তু এই ধরণের গল্পের সংখ্যা যেমন স্বল্প তেমনই সেইসব গল্পে রাজনীতির প্রভাবও অনেকাংশে সীমিত। উপরের রাজনৈতিক গল্পগুলির আলোচনায় এই সত্য প্রকাশিত। রাজনীতি মানুষকে কেমন ক'রে প্রভাবিত করে তার পরিচয় পরিস্ফুট হয় এমন একটি গল্প আলোচনা করে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার আলোচনা সমাপ্ত করবো। এমন একটি গল্প হল 'বিষাদযোগ'। গল্পটির গোত্র নির্ণয়ে একে হয়তো যথার্থ রাজনৈতিক গল্প বলা চলে না কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ মানুষকে, তার চিন্তা চেতনা, বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ আচরণকে এমন কি তার ব্যবহার ও কথাবার্তাকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে 'বিষাদযোগ' গল্পটিতে তা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

'বিষাদযোগ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। গল্পে নকশাল আমলের উত্তাল দিনের পটভূমিকায় এক অরাজনৈতিক চরিত্র শুভেন্দুর অপর বন্ধু বিজু বা বিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ঘটনা ও বিজুর বোনের জীবনের একটি ট্র্যাজেডির পরিচয় লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শুভেন্দুর বন্ধু বিজন বা বিজুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা এবং এই আপাদমস্তক রাজনৈতিক চরিত্রটিই গল্পের রাজনৈতিক স্পর্শকে প্রকাশ করেছে। নকশাল আমলের উত্তাল দিনের পরিচয় রয়েছে গল্পে তবে তা প্রত্যক্ষভাবে নয়। তা ফুটে উঠেছে গল্পের চরিত্রদের বিশেষ করে শুভেন্দু ও বিজনের কথোপথনে আর এই কথোপকথন বিজন চরিত্রটির বিশিষ্ট রাজনৈতিক দিকটিকেও পরিস্ফুট করতে সহায়ক হয়েছে। শুভেন্দু বিজনের মাকে বলেছে — "সত্যি

মাসীমা কলকাতায় এসে দেখছি না এলেই ভালো হত, বোমা-বারুদ, গুলি-গোলা লেগেই আছে। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়ার জো নেই। কখন কোথায় কি বিভ্রাট ঘটে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে কলকাতা যেন এক পাগলের দুঃস্বপ্ন।" কিন্তু বিজন এই বক্তব্য শুনে চুপ থাকেনি বরং 'ফোঁস' করে উঠে তীব্র কণ্ঠে বলেছে — "স্বপ্ন নয় শুভেন্দু, কঠোর বাস্তব। বলতে পার ভয়ঙ্কর বাস্তব। কাল যবে জাগে তাকে সভয়ে অকাল কহে সবে। বহুদিনের অবিচার অব্যবস্থা গলদ আর গ্লানি জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে।"

এইভাবে গল্পের চরিত্রদের সংলাপে একটি রাজনৈতিক চরিত্রের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন লেখক। এছাড়া বিজন চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে শুভেন্দুর চিন্তা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। শুভেন্দুর স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে ফুটে উঠেছে বিজুর ছাত্রজীবনের কথা যখন তার রাজনীতিতে প্রবেশের প্রস্তুতিপর্ব চলছে — "ও আড্ডা দেয় না, সিগারেট খায় না,ক্বচিৎ কখনো সিনেমা দেখে। যেটুকু সময় পায় পড়াশোনা করে। আর বসে বসে ভাবে। চোখের সামনে ও যেন কিছু একটা দেখে। নিজের কল্পনার পৃথিবীকে। শুভেন্দু ভেবেছিল ও বুঝি কবিতা লিখবে। কিন্তু তা লিখল না। ও পদ্য লিখল না গদ্য লিখল না। সায়ান্সের ছেলে, অথচ সেই বিজ্ঞানচর্চাও ছেড়ে দিল। ও নিজের পাড়ায় স্কুল গড়ল, যুব সমিতি গড়ে তুলল। সমাজের যে স্তরের মানুষকে শুভেন্দু দূর থেকে দেখে বিজু তাদের ভিতরে চলে গেল।"

অপরদিকে শুভেন্দু বাস্তববাদী। বিজুর মত দেশোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েনি সে। বরং ভালো রেজাল্ট করেছে, ভালো চাকরি পেয়েছে এবং স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বিবাহিত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করছে। অন্য প্রান্তে 'ম্যাথেম্যাটিক্সে ব্রিলিয়ান্ট' বিজু অঙ্ক নিয়ে থাকেনি। জটিল গাণিতিক হিসেবে নিজের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করেনি বরং নিজের মতাদর্শকে জয়ী করতে চেয়েছে জীবনে। সে প্রেম চায়নি, যশ চায়নি, অর্থ চায়নি, নিজের দলের প্রধান স্থানও লাভ করেনি। বিজুর এই ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে শুভেন্দু শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু আবার মনে মনে সন্দিহানও হয়েছে। তার মনে হয়েছে — একটি বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা, নিজের জীবনকে পদে পদে বঞ্চিত করে সকল বঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটানোর এই ব্রত কী মানুষকে পদে পদে আহত করেনা। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, রাজনৈতিক চেতনাই কি একমাত্র মানবিক চেতনা, আর রাজনৈতিক কর্মই কি মানবের একমাত্র কর্ম। এ যেন শুভেন্দুর আড়ালে লেখকের নিজেরই জিজ্ঞাসা। বিজুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও শুভেন্দু বিজুর জীবনের অসম্পূর্ণতা বা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধেও সন্দিগ্ধ। লেখকের বর্ণনা এইরকম — "শুভেন্দু শ্রদ্ধা করে বিজনকে। যে শুধু নিজের জন্যে ভাবে না, দশজনের জন্য ভাবে, দশজনের কিছু না কিছু করে, আরো দশজনের শ্রদ্ধা সে পাবেই। কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুভেন্দু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি রাজনৈতিক কর্মী আর নেতা মাত্রেই অতিমানব? বহুমানবের সুখ দুঃখে তাঁদের হৃদয় আন্দোলিত? রাজনৈতিক চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্য? রাজনৈতিক কর্ম-মাত্রই একমাত্র

কর্ম? না কি লোকের আরো পাঁচটা কর্মপ্রবণতার মধ্যে এও একটি?" শুভেন্দুর আরও মনে হয়েছে যে, বিজন মুখে খুবই বিনয়ী, কিন্তু তার এই কর্মধারা, ত্যাগ ও সংগ্রামের কারণে সে মনে মনে গর্ব ও অহঙ্কার বোধ করে। এই প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার তাকে আত্মদানে উদ্‌বুদ্ধ করে, একই সঙ্গে তাঁর মনে অনুভব হয়েছে— "সব দলেরই তো একই বাণী, একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া বোধহয় কাজ করা চলে না। এই অহঙ্কার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার ভিতরে ভিতরে মারেও।"

এইভাবে দেখা যায় কেমন ক'রে একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়। রাজনৈতিক এক বিশিষ্ট মতাদর্শ কেমন করে তাকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে ত্যাগে উৎসাহী ও স্বার্থহীনতায় আগ্রহী ক'রে তোলে। কিন্তু লেখকের একটি জিজ্ঞাসা এর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে যে, এই সুনির্দিষ্ট একটি মতাদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে তোলার মধ্যে কি কোথাও কোনো ফাঁকি নেই, এর ফলে কি মানুষের মানবিক অনুভূতিগুলিকে আহত করা হয়না? এই অন্তর্লীন প্রশ্নটিই গল্পের মূল উপজীব্য। মানুষের জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা রাজনীতির যান্ত্রিক প্রভাব এ গল্পকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। অপরদিকে বিজন চরিত্রের বিপরীতে শুভেন্দু চরিত্রটিকে সৃষ্টি ক'রে তথাকথিত অরাজনৈতিক মানুষদের চিন্তা চেতনাকেও প্রকাশ করেছেন লেখক।

এইভাবে চরিত্রদের রাজনৈতিক চেতনার বিশ্লেষণ ছাড়াও নকশাল আমলে কেমন করে উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী নবযুবকেরা প্রাণদান করেছে তার ছবিও পরোক্ষে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বিজনের স্বল্প ভাষণে উঠে এসেছে এমনই একটি তথ্য — "শিখা একটি ছেলেকে ভালোবাসত। খুব ব্রাইট বয়। হঠাৎ গোলমালের মধ্যে পড়ে মারা গেল। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। বাঁচানো যায়নি।" এইভাবে দেখা যায় একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে কয়েকটি রাজনৈতিক চরিত্রকে তাদের কার্যকলাপ, জীবনদৃষ্টি ও অনেকাংশে পরিণতিকে লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন। আবার একই সঙ্গে তুলনা দেবার জন্য ও চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করবার জন্য বিপরীত শ্রেণির চরিত্রও সৃষ্টি করে তাদের বিশ্লেষণের পথ সুগম করেছেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা যে সংকীর্ণ দৃষ্টিপ্রসুত নয়, তা যে বৃহত্তর অর্থে মানবিক তা তাঁর এই ধরনের গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে বারংবার প্রমানিত হয়।

খ. দেশবিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে এবং এ বঙ্গে আগত মানুষদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পগুলি পর্যলোচনা করলে কেবলমাত্র ছোটগল্পকারের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না, মানুষের সংগ্রামী দিক সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আসলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু।

যদিও তিনি নিজে দেশবিভাগের বহু পূর্বে ১৯৩৫ সালেই ফরিদপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কলকাতায় নিয়ে আসেন স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালে। ফলে দেশবিভাগ ও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকাল উভয় সময়েই অবিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত বাংলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি যে কেবল দেশবিভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের সুকঠোর জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বয়ং সেই উদ্বাস্তু মানুষদের একজন। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেশবিভাগের পূর্ব থেকে বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিনি কলকাতাবাসী। সেই সময় থেকেই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু। অতএব দেখা যায় দেশবিভাগের পর সরকারী উদ্বাস্তু হবার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথের উদ্বাস্তু হয়ে জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া স্ত্রী, পুত্র পরিবার — প্রতিপালনের জন্য চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। অস্থায়ী ও স্বল্পআয়ের সেই সব বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধের সময় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য দ্রব্য পরীক্ষকের কাজ থেকে শুরু ক'রে প্রতিরক্ষা বিভাগে করণিকের কাজ, ব্যাঙ্কে কাজ, খবরের কাগজের অফিসে কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল ছাত্র পড়ানোর কাজ। এই সময়েই পত্রপত্রিকায় গল্প লিখেও তিনি স্বল্প অর্থের সংস্থান করেছিলেন। মেসবাড়িতে, ভাড়াবাড়িতে একাধিক ভাড়াটের সঙ্গে তিনি এই সময় দিনযাপন করেছেন। তাঁর এই জীবনসংগ্রামের চিত্র তাঁর লেখা চিঠি পত্রাদিতেও রয়েছে। ১২ই ভাদ্র, ১৯৪৬ তারিখে কলকাতা থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "তার চেয়ে কলকাতাতেই টুইশন ও চাকরির খোঁজ করা যাক আরও কিছুদিন। দেখা যাক, সাহিত্যচর্চা করে কিছু পাওয়া যায় কিনা। ....আর একটা পনের টাকার টুইশন জুটবার খুবই সম্ভাবনা আছে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে। আই. এর একটা ছেলেকে লজিক পড়াতে হবে। আনন্দবাজারে চেষ্টা করছি এখনও। কিছু কিছু আশা পাওয়া যাচ্ছে। তুমি কিছু চিন্তা করনা। যেভাবেই হোক, খাওয়া পরার সংস্থান করতেই পারবই।"[১৫]

অতএব দেখা যাচ্ছে একটা সময় নরেন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে খাওয়া পরার সংস্থান করতেই চিন্তিত ছিলেন এবং এই সময় কঠোর সংগ্রাম ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। কখনও বাস্তুচ্যুত এই মানুষটি শহরের জীবনযুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কখনও ভেবেছেন পুনরায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে ফিরে যাবেন। তাঁর এই মানসিক অবস্থার পরিচয়ও রয়েছে তাঁর লেখা চিঠিপত্রে —

"মাঝে মধ্যে আমার গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে, সেখানেই ইচ্ছা করে কর্মক্ষেত্র তৈরী করতে। শহরে আমি রস পাচ্ছিনে, শহর আমার কাছে বড় শুকনো, বড় নীরস মনে হচ্ছে। ....আমার ভয় হয়, এসব দিক থেকে আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হবেনা। কিন্তু কোনও অফিসে ৪০/৫০ টাকায় কি তার চেয়ে কিছু বেশীতে সারা দিন, সারা জীবন কাটবে এ কথা ভাবতে আমার ভালো লাগেনা।

....কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্তত কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে এবং তা নিজেকেই অর্জন করতে হয়।"[১৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রামের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, এই জীবন সংগ্রামের একজন অংশীদারও বটে। কলকাতায় যেহেতু তিনি প্রথমে একা এসেছিলেন আর পরিবারের লোকজন ১৯৪৮ -এর পূর্ব পর্যন্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেইজন্য তিনি কেবল দেশবিভাগের ফলে ভারতবর্ষে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জীবনযুদ্ধকেই প্রত্যক্ষ করেননি, একই সঙ্গে সাক্ষী হয়েছিলেন দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া মানুষদের মানসিক টানাপোড়েনের। এই কারণে নরেন্দ্রনাথের যে গল্প গুলিতে দেশবিভাগ পরবর্তী জীবনসংগ্রামের চিত্র পরিস্ফুট তাদের দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই বিভাগ দুটি হল —

ক. দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আগত মানুষের জীবনসংগ্রাম। এবং

খ. দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গেই থেকে যাওয়া মানুষের কাহিনি।

এই প্রথম বিভাগের গল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য হল 'দ্বিচারিণী', 'কাঠগোলাপ', 'হেডমাস্টার' প্রভৃতি গল্পগুলি। আর 'পালঙ্ক' গল্পটিকে দ্বিতীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

তবে এ'কথা এখানে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য যে, এই গল্পগুলির মূল বিষয় কেবলমাত্র দেশভাগ হয়তো নয় কিন্তু এ গল্পের চরিত্রদের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব দেশভাগের। দেশভাগ ও তজ্জাত পরিস্থিতির শিকার এই মানুষগুলি সহসা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেমন ক'রে প্রতিক্রিয়া করেছে তা এই গল্পগুলির প্রধান উপজীব্য। একস্থান থেকে অন্যস্থানে কপর্দক শূন্য অবস্থায় এসে উদ্বাস্তু মানুষদের মানসিকতা কেমন ক'রে পরিবর্তিত হ'ল বা হ'ল না তার প্রকাশে এই গল্পগুলি উজ্জ্বল।

'কাঠগোলাপ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গল্পের ঘটনা ধারাকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে আছে গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র নীরদ ও অণিমা, যারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী, তাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আগমন। দ্বিতীয় অংশ — নতুন নতুন শহরবাসী হ'য়ে শহরের প্রতি অণিমার মোহমুগ্ধতা ও শহুরে হবার তীব্র বাসনা ও অপরিণামদর্শিতা। তৃতীয় অংশ — এর পরিণামে নীরদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অণিমার কঠোরতর জীবন সংগ্রামে অংশীদারিত্বের কাহিনি। এই গল্পে কাহিনির 'ক্রাইসিস' বা 'ক্লাইম্যাক্স' অংশ কেমন করে গড়ে উঠেছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে গল্পের গঠন বিন্যাসের আলোচনায় বিস্তারিত করা হবে, এখানে দেখা যাক গল্পের কাহিনি কী এবং তাতে ছিন্নমূল একটি উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনযুদ্ধের চিত্র কেমন ক'রে পরিস্ফুট।

নীরদ ও অণিমার কলকাতায় থাকবার বাড়ির বর্ণনায় কলকাতায় উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের বাসস্থানের অপ্রতুলতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রাপ্তির পরিচয় প্রকাশিত —

"অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাৎসেঁতে ঘর, চুন-বালি-ঝরা কত কালের পুরনো দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের আযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে; আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা-ভরা উঠান। মশা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘর।"

নীরদদের এই মনুষ্য বসবাসের প্রায় অনুপযুক্ত স্থানও অনেক মানুষের পক্ষে ঈর্ষার বিষয়। বেলেঘাটা, নারকেলডাঙা, চড়কডাঙা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে যে সকল উদ্বাস্তু মানুষের ঢল, তাদের পক্ষে নীরদের মত বাসগৃহ জোগাড় করাও সম্ভব হয়নি। অণিমাদের গ্রামের সম্পন্ন ঘোষ পরিবারের বড় বউ মল্লিকা কলকাতায় এসে যে বাড়িতে উঠেছে তার বর্ণনাতেও দেশবিভাগ পরবর্তীকালের কলকাতার চিত্র পরিস্ফুট — "মিঞাবাগানের এক বস্তীর মধ্যে, আলো নেই, জল নেই বাড়িতে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আনিয়ে নিতে হয়।"

শহরে আসা অণিমার যেমন ফেলে আসা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গর্ব ও স্মৃতিমেদুরতা আছে তেমনি কলকাতা শহরের আধুনিকতাতেও সে মুগ্ধ। তার নিজের মনে হয়েছে নদীয়া-চব্বিশ পরগণার গ্রাম আর তাদের ফরিদপুর বরিশালের গ্রামের কোনো তুলনাই হয় না। স্কুল, পোস্ট অফিস, হাট বাজার এ সব দিক দিয়েই পূর্ববঙ্গের গ্রাম এদেশের শহরের সমান। তবুও কলকাতায় এসে শহুরে জীবনের প্রথম স্পর্শ ও স্বাদ পাওয়া অণিমার পক্ষে কলকাতায় আগমন সৌভাগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। দেশবিভাগের ফলশ্রুতিকে সে নিজে প্রাথমিকভাবে দুর্ভাগ্য বলে অনুভব করতে পারেনি, বরং তার মনে হয়েছে — "শাপে বর হ'ল। ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে; হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার। ..... নইলে কি আসতে পারতুম কলকাতায়?"

কলকাতায় এসে অণিমার শুধু চালচলন ও আচার ব্যবহারেই পরিবর্তন আসেনি "মেয়েদের দাবী, মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের মর্যাদা" প্রভৃতি আধুনিক ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও কিছু কিছু জ্ঞান হয়েছে। সে পাড়া প্রতিবেশিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে, আলাপচারিতায় মুগ্ধ করে সকলকে। — কাহিনির এই পর্যন্ত নীরদ ও অণিমার জীবন সংগ্রাম কঠোরতর হয়ে উঠেনি, কিন্তু নীরদের সোয়া দু'শ টাকার চাকরি, নীরদ একদিন ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অণিমার কারণে — অকারণে অন্যের টেলিফোন ব্যবহার করার শখ এই চাকরি ছাড়বার কারণ। প্রতিবেশির ফোন থেকে পরিচিত, অর্ধ পরিচিত অনেককেই ফোন করত অণিমা । একদিন নীরদের অফিসেও সে টেলিফোন করেছে আর নীরদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

অফিসের টেলিফোনকে ব্যক্তিগত কাজে আটকে রাখবার জন্য অপমানিত হতে হয়েছে নীরদকে। অপমানিত নীরদ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছে। এই চাকরি চলে যাবার পর নীরদ অণিমার পরিবারের — এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনযুদ্ধ, কঠোরতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অর্থের অভাবে নীরদ পুনরায় অণিমাকে গ্রামে রেখে আসতে চেয়েছে, কিন্তু নীরদের এই প্রস্তাবে অণিমা কিছুতেই সম্মত হয়নি। আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অণিমার বাহ্যিক আচার আচরণও বদলে গেছে, তার শখ আহ্লাদ গেছে, ট্রামে বাসে করে ভ্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে, সিনেমা দেখা, পাড়াপড়শি, পাড়াতুতো দেবর ননদদের চা-জলখাবার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। আশে পাশের মানুষরাও অনুভব করেছে এই পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা, তারাও পরিত্যাগ করেছে এদের সংস্পর্শ। নীরদ ও অণিমা এদের পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রীতির অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন এইভাবে — "দু'জনের মধ্যে দিনের মধ্যে দু'তিনবার ক'রে যে ঝগড়া লাগছে, আজকাল তা ঠিক দাম্পত্য কলহ নয়, দু'টি অর্ধভুক্ত, বুভুক্ষু নরনারীর বিসম্বাদ — পরস্পরকে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ।"

নীরদ একটি ষাট টাকার চাকরি কোনো রকমে জোগাড় করেছে কিন্তু তাতে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। নীরদ তীব্র আর্থিক দুরবস্থার সময় পূর্ব পরিচিত, অর্ধ পরিচিত মানুষদের কর্মপ্রচেষ্টার খবর নিয়েছে। তাদের কর্মপ্রবণতাকে অনুসরণ ক'রে অর্থ উপার্জনের উপায় করার চেষ্টার কথা ভেবেছে। গল্পের এই অংশেও উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রামের চিত্র উদ্ভাসিত, যেখানে দেখা যায়, পূর্বতন রেজেস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক ভুবন ও ফটিক বেলেঘাটার বাজারে কুমড়ো ফালি ক'রে বিক্রি করে, পূর্বতন শিক্ষক নবীন অফিসে অফিসে ঘুরে ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি প্রভৃতি মেরামত করে, আবার চরকুসুমপুরের ভদ্রেরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হ'য়ে বউবাজারের মোড়ে গামছা বিক্রি করে।

কিন্তু এইসব জীবিকা গ্রহণ করা নীরদের পক্ষে সম্ভব হয়নি; অপরদিকে তার আর্থিক অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে। ক্রমাগত ব্যয় সংকোচ করেও আর্থিক দুরবস্থা দূর করা যায়নি। কয়লা ধরাবার জন্য আর তাদের পরিবারে কাঠ কেনা হয় না, বরং নিজের হাতে ঘুঁটে দেয় অণিমা, কাপড় জামা আর লন্ড্রিতে কাঁচতে দেওয়া হয় না, খবরের কাগজ নেওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার খরচের জন্য বরাদ্দ হয়েছে দৈনিক দু'টাকার বদলে এক টাকা, কখনো চোদ্দ আনা। এখন খবরের কাগজ নীরদ বাইরের চায়ের দোকান থেকে দেখে আসে, আর সেই কাগজে সে দেখে কেবল কর্মখালির বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু শরণাগতদের সাহায্যকেন্দ্র বা রিলিফ সেন্টারে রেশন কার্ড পিছু সপ্তাহের চাল, ময়দা, আটা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার লাইন চোখ পড়ে অসহায় নীরদের আর আগত ভবিষ্যতে সেই লাইনেই মুখ আড়াল ক'রে দাঁড়াতে হবে কিনা ভেবে অণিমা আতঙ্কিত হয়। স্ত্রীসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে অণিমাও অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা করেছে। কখনও গানের স্কুলে,

কখনও সেলাই শেখাবার স্কুলে আবার কখনও নার্সিং -এর কাজে যোগদানের চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতার অভাবে সেই প্রচেষ্টা অণিমার ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অণিমা নিজে কিছু উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে তাদেরই মত এদেশে আগত দুই বয়স্থা মহিলা অণিমাকে দিয়েছে কিছু আর্থিক উপার্জনের খোঁজ। সে এখন রাত জেগে স্বামী নীরদকে গোপন ক'রে কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে ঠোঙা বানায়। একদিন সহসা রাতে ঘুম ভেঙে গেলে নীরদ দেখেছে কাজ করতে করতে ক্লান্ত অণিমার নিদ্রিত মূর্তি। সারাদিনের গৃহস্থালীদের কাজের পর সংসারের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ক্লান্ত শরীরে ঠোঙা তৈরি করতে করতে অণিমা ঘুমিয়ে পড়েছে তার কাজের উপকরণের মধ্যেই। নীরদের কাছে অণিমার গোপন কর্ম প্রচেষ্টা ধরা পড়ে গেছে আর এই সত্যের উদ্‌ঘাটনেই গল্পের পরিসমাপ্তি।

এইভাবে দেখা যায় গল্পটিতে একটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার কেমন ক'রে এক নতুন দেশে, এক নতুন শহরে তাদের অস্তিত্বের শিকড়কে প্রোথিত করার চেষ্টা করেছে। কেমন ক'রে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান জোগাড়ের কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। নীরদ ও অণিমার জীবনযাত্রার বর্ণনা, তাদের কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে আর তার সঙ্গে অন্যান্য ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের পরিচয় স্বল্প হ'লেও কিছুকিছু ক'রে গল্পে পরিস্ফুট। এই অংশে দেশবিভাগ পরবর্তী দেশত্যাগী মানুষের জীবনযুদ্ধের চিত্রটি প্রকাশিত হয়, আবার একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বের দিকটিও সমানভাবে প্রকাশিত। ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রামের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে নতুন দেশে আসবার পরেও পূর্ববঙ্গের জন্য এই মানুষগুলির স্মৃতিমেদুরতা। নরেন্দ্রনাথ নিজে যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা শহরে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ সেই সময় তিনি নিজে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি গ্রামে ফিরে যেতে চান, শহরে তেমনভাবে তিনি রস পাচ্ছেন না। এই সঙ্গে আরও লেখেন — "চাষীদের নিয়ে, কৃষকদের নিয়ে নতুন সভ্যতা, নতুন সাহিত্য গড়ে তুলতে ইচ্ছা করে।"[১৭]

একইভাবে 'কাঠগোলাপ' গল্পের নায়ক নীরদও পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে আক্রান্ত। নীরদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আরও সাদৃশ্য আছে। নীরদ যেমন দীর্ঘ দশ বছর কলকাতায় একাকী বসবাসের পরেও কলকাতাকে ভালোবাসতে পারেনি, তেমনি লেখকও এই রকমই সময়কাল কলকাতায় অতিবাহিত করার পরেও কলকাতাকে খুঁজে পেয়েছেন শুকনো ও নীরস রূপেই। কলকাতা অপেক্ষা গ্রাম বাংলা বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গই তাদের মনকে গভীরভাবে অধিকার ক'রে রেখেছে। 'কাঠগোলাপ' গল্পে নীরদের মানসিকতার বর্ণনায় তাই যেন আমরা নরেন্দ্রনাথের মানসিকতারই ছায়াপাত লক্ষ করি — "বছর দশেক ধ'রে শহরেই আছে নীরদ, পড়াশুনো করেছে, চাকরি-বাকরি করেছে, তবু সে নাগরিক নয়, মনে মনে গ্রামিক। এখনো সেই নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-জঙ্গল, বেতের ঝোপ, বাঁশের ঝাড় তার নাড়ির সঙ্গে

জড়িয়ে আছে, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মিলেছে, স্মৃতিতে আর স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তবে মেলেনি। ছুটিছাটায় দু-এক সপ্তাহ, দু-এক মাস গ্রামে থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নীরদ, পালাই পালাই করেছে তার মন, পালিয়ে এসেছেও। কিন্তু শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বাঁশের ঝাড়, গাছের ছায়া মনকে ঢেকে ফেলেছে, ছেয়ে ফেলেছে। শহরে যে সে কিছু ক'রে উঠতে পারল না, বোধহয় এই জন্যই। এত বড় রাজধানী সারা দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার কাছে গাঁয়ের বাজার ছাড়া বেশি কিছু নয়। এখানে লোকে আসে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারপর খেয়া পার হয়ে ফের যায় গ্রামে। থাকবার ঘুমাবার ঘর-গৃহস্থালী, চাষবাসের জায়গা সেখানে। এত বড় কলকাতা নীরদের মনে সেই হাটুরে গঞ্জের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়তে পারেনি।"

মনের সমর্থন না থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতির চাপে নীরদকে বাসা বাঁধতে হয়েছে শহর কলকাতায়, বস্তু জগতের সঙ্গে আপোস করতে হয়েছে, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে পালনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হয়েছে, কারণ তারা নীরদের কাছে 'দেশের সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি'। প্রসঙ্গত একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নরেন্দ্রনাথকেও তাঁর ব্যক্তিজীবনে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। ১১ই জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি পত্রতে তিনি লেখেন — "সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, শহরেই থাকব না গ্রামে গিয়েই থাকব। শহরে তোমাদের নিয়ে থাকতে হ'লে যতখানি আর্থিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তার যে অনেক নিচেই পড়ে আছি, তা তোমার কাছে স্বীকার করতে কখনও সংকোচ করিনি, আজও করব না। যেমন তেমনভাবে যেমন তেমন জায়গায় নিজে থাকতে পারি, কিন্তু তোমাদের আনতে কষ্ট হয়।" এই চিঠিতেই অন্যত্র তিনি লেখেন — "নিজের মনের ঝোঁকটা যে শহরে থাকার দিকেই বেশি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, অন্তত কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তোমাদের নিয়ে এখানেই বাস করবার সুবিধা এবং সাধ্য যাতে হয় সেদিকেই চেষ্টা করতে হবে। .....দিবু ডনের পড়াশুনোর সমস্যা রয়েছে। অন্তত পক্ষে আরও পাঁচ-ছয় বছর পরে দিবুকে হয়তো নিজের কাছে এনে রাখা যাবে, কিন্তু তার আগে তা পারা যাবে না।"[১৮]

— এ যেন অণিমা ও নান্তুকে নিয়ে নীরদের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতপক্ষে নীরদ ও অণিমার জীবন সংগ্রামের চিত্র অনেকটাই নরেন্দ্রনাথের নিজস্ব, বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। গল্পের পরিণতি ও 'ট্রিটমেন্ট' হয়তো আলাদা, কিন্তু একটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনসংগ্রাম ও তার সঙ্গে অন্যান্য ছিন্নমূল মানুষদেরও উল্লেখ এবং লেখকের অতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই 'কাঠগোলাপ' একটি পৃথক উচ্চতা লাভ করেছে।

নরেন্দ্রনাথ রচিত যে সব ছোটগল্পগুলিতে দেশভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে

সেই ধারার গল্পগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'পালঙ্ক'। 'পালঙ্ক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায়। অবশ্য গল্পটি প্রকাশের পূর্বে শ্রাবণ ১৩৫৯ তারিখে বেতারে পঠিত হয়েছিল। 'পালঙ্ক' গল্পটিতে দেশবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও এই শ্রেণির অন্য গল্পের থেকে এই গল্পটি ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কারণ 'হেডমাস্টার', 'দ্বিচারিণী', 'কাঠগোলাপ' প্রভৃতি গল্পের মত এ গল্পে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র নয় বরং দেশভাগের পরও দেশেই থেকে যাওয়া, নিজের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা এক মানুষের কাহিনি বিবৃত। গল্পের কাহিনি বা আখ্যান অংশ সুবিশাল নয়, আর এই কাহিনি অংশে একটি পালঙ্কেকে ঘিরে পালঙ্কের মূল মালিক রাজমোহন ও সেই পালঙ্কের নতুন মালিক মকবুলের অন্তর্লীন মানসিক সংঘাতের চিত্র পরিস্ফুট। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে পরিস্ফুট হয়েছে দেশত্যাগ না করে পূর্ব পাকিস্তানেই পূর্ব অভিজাত্য, মান-মর্যাদা কে পরিত্যাগ না ক'রে পিতৃপুরুষের ভিটেতে থেকে যাওয়া মানুষের মানসিক অবস্থার কথা। দেশ-বিভাগের পাঁচ বছরের মধ্যে রচিত এই গল্পের কাহিনিভাগ নিয়ে সমালোচক বলেন — "দেশবিভাজনের অভিশাপ, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জাত্যভিমান এসব মিলেমিশেই 'পালঙ্ক' গল্পের কাহিনীভাগ নির্মিত।"[১৯]

গল্পের কাহিনি অংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশবিভাগের পর বৃদ্ধ রাজমোহনের পুত্র সুরেন তার স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে ভারতবর্ষে চলে গেছে কিন্তু রাজমোহনকে কিছুতেই তার পিতৃপুরুষের ভিটে পরিত্যাগ করতে রাজি করানো যায় নি। যখন গ্রামের প্রায় সকল হিন্দু পরিবারই তাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রি ক'রে ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছে, যখন গ্রাম শূন্য করে অন্যান্য বৈষয়িক মানুষেরা নতুন দেশে গিয়েও কিছুটা গুছিয়ে বসতে পেরেছে তখন রাজমোহন নিজের ভিটে মাটির মায়া পরিত্যাগ করতে পারেনি আর পূর্ব পাকিস্তান দেশবিভাগের পর নতুন দেশ হয়ে উঠলেও সেই দেশকে তার নিজের দেশ নয় বলে মনে করতে পারেননি। একটি গাছের ডাল, এক ছটাক জমিও তিনি প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারবেন না। তার মৃত্যুর পর মুসলমানেরা সব লুটেপুটে খাবে তাও স্বীকার, কিন্তু তিনি নিজে হাতে নিজের সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রয় করতে পারবেন না। কারণ তিনি বলেন — "আমি কিনি আমি বেচি না।" জীবনে কিছুই রাজমোহন বিক্রয় করেননি, শুধু একটি জিনিসই তিনি ক্রোধবশত বিক্রি করে ফেলেছেন, তা হ'ল তার পালঙ্কখানা। রাজমোহন, যিনি গ্রামে ধলাকর্তা নামে পরিচিত তার এই পালঙ্ক বিক্রয়ের খবরে গ্রামের লোক হতবাক হয়ে গেছে। কারণ তারা জানে নিজের সম্পত্তির এক কণা অংশ বিক্রয় করতেও ধলাকর্তার কষ্ট হয়, তার সম্মানে বাধে। তিনি ভিটের একটি বাঁশ বিক্রয় করেন না, এমন ধলাকর্তা তার পালঙ্ক কেন বিক্রয় করলেন, তার একটা ইতিহাস আছে। রাজমোহনের পুত্র সুরেন তার স্ত্রী অসীমা ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে বেলেঘাটায় যে বাড়িতে উঠেছে সে বাড়ির পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

স্যাঁতস্যাঁতে সেই বাড়ির দেয়াল আর মেঝে দিয়ে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে পড়ছে। এমন স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে শুয়ে তাদের পুত্র কন্যা কানু, টেনু, রীণা, মীনা প্রভৃতিদের অসুখ বিসুখের আর বিরাম নেই। তাই স্বামী সুরেনের সম্মতিক্রমে অসীমা শ্বশুর রাজমোহনকে পত্র দিয়ে জানিয়েছে যে, তার বিয়েতে যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত সেগুন কাঠের পালঙ্কটি যেন রাজমোহন বিক্রয় ক'রে সেই টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে দেন, যাতে সেখানে একটি খাট বা তক্তপোষ কিনে অসীমা তার পুত্রকন্যাদের কষ্ট দূর করতে পারে। যেহেতু পালঙ্কটি রাজমোহনের নিজের সম্পত্তি নয় সেইহেতু সেটি বিক্রয় করতে তার মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার বা অসম্মত হবার কোনো কারণ থাকবার কথা নয় বলেই অসীমা চিঠিতে উল্লেখ করেছে।

স্বভাবতই এই পত্রাঘাত সহ্য করা রাজমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পত্রের বিষয়বস্তু রাজমোহনের কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক ও অসম্মানজনক বলে বোধ হয়েছে। তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখে তিনি আকস্মিক উত্তেজনাবশত সেই পালঙ্ক যার দাম দুশো টাকার কম হবে না তা মকবুল শেখের কাছে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করেছেন। মকবুল কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ নয়। হতদরিদ্র মকবুল দরিদ্র জীর্ণ গৃহে বসবাস করে। তার জীবনযাত্রার সহায় শারীরিক শ্রম ও জীর্ণতর একটি নৌকা। দেশত্যাগের হুজুগে হিন্দুরা বহু খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন কোসন জলের দরে বিক্রয় করেছে, কিন্তু অর্থের অভাবে মকবুল সে সবের কিছুই কিনতে পারেনি। এখন ধলাকর্তা রাগের মাথায় একটি চমৎকার পালঙ্ক বিক্রয় করতে যাচ্ছেন দেখে মকবুল সস্তার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। বহুদিনের সঞ্চিত রক্তজল করা অর্থ, যা দিয়ে সে গরু কিনবে, ঘর ছাইবে, স্ত্রীর গয়না গড়িয়ে দেবে বলে স্থির ক'রেছিল তাই সে ব্যয় করেছে সেই পালঙ্ক ক্রয় করবার জন্য। সেই পালঙ্কও অতীব শৌখিন ও দামি জিনিস — "আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি, চারিদিকে চারটি পায়ায় বড় বড় বাঘের থাবা, হাতখানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নকসার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোট ছোট হাতীর সারি।"

রাগের মাথায়, আকস্মিক উত্তেজনাবশত এমন পালঙ্ক ধলাকর্তা মকবুলকে বিক্রয় ক'রে দিয়েছেন বটে কিন্তু রাগ পড়তেই তিনি তার পালঙ্কের জন্য গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং তার পালঙ্কখানা পুনরায় ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। ঘর সংসার, তৈজসপত্র সকল কিছুর উপরেই অগাধ মায়া রাজমোহনের, তাই যে ঘরে সেই পালঙ্কখানা ছিল সেই ঘরে তিনি প্রবেশ করেই বেড়িয়ে এসেছেন। পালঙ্ক শূন্য সেই ফাঁকা ঘরের শূন্যতা যেন তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করেছে, তার বুক খালি ক'রে দিয়েছে। নিজের ঘরে এসে তিনি আহ্নিকে বসেছেন কিন্তু ইষ্ট মন্ত্রের বদলে বারবার পালঙ্কের কথাই তার মনে হয়েছে। পালঙ্ক হারানোর শূন্যতা তার জীবনের অন্যান্য শূন্যতাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। নিজের মৃত স্ত্রী ও দেশবিভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি প্রভৃতিদের বিচ্ছেদ বেদনাকে তিনি পুনরায় অন্তরে অনুভব করেছেন। দেশবিভাগের ফলে দেশেই থেকে যাওয়া নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃসঙ্গতা

ও একাকীত্বের বেদনা যেন ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায় — "হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে - যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনির বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে; এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।"

পালঙ্কটি ফিরে পাবার জন্য তিনি মকবুলকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু মকবুল দেখা করেনি। ধলাকর্তার কমবেয়সী ভৃত্য কালুর কথায় ফুটে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থা, হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের বিনষ্টির ইঙ্গিত; মকবুল ধলাকর্তার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করায় কালু বলেছে — "এখন ওয়াগো দিনকাল ওয়াগোই রাজত্ব।"

এরপর ধলাকর্তা স্বয়ং গেছেন মকবুলের বাড়ি। বিক্রয়মূল্যের উপর আরও পাঁচটি টাকা দিয়ে তিনি পালঙ্কটি ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন কিন্তু তার এ প্রস্তাবে মকবুল রাজি হয়নি; কিন্তু ধলাকর্তা এতেও নিরস্ত হননি, পালঙ্কটি ফিরে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেননি। শুধু পালঙ্ক নয় বাড়ির প্রতিটি জিনিসের প্রতিই তার মমতা অসীম। তাই ছদন মৃধার মত মানী গুণী ও ধন্যাঢ্য ব্যক্তি যখন রাজমোহনের কোনও জিনিস বিক্রি করলে তা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তখন রাজমোহন তীব্র ক্রোধে বলেছে — "তুমি চইল্যা যাও মেরধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।" এই অসীম আসক্তিবশত রাজমোহন মকবুলের অসম্মতিতে ক্ষান্ত না হয়ে পালঙ্কটি পুনরায় হস্তগত করবার প্রত্যাশায় গ্রামের মাতব্বর মানুষদের সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তুগ্রামের সম্মানিত ব্যক্তিরা সমবেতভাবে মকবুলকে বোঝানোর চেষ্টা করার পরও মকবুল ধলাকর্তাকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়নি। অপরদিকে পাড়ার মুসলমানেরাও মকবুলের পক্ষই অবলম্বন করেছে। তাই গ্রামের অপর ব্যক্তি শরৎ বলেছে — "সব মেঞাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা। তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখের পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইয়া যায়ন। যখন যেমন তখন তেমন।" — এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ পরবর্তী দুই ধর্মের মানুষের পারস্পরিক অবিশ্বাসের চিত্রটিই যেন প্রকাশিত।

এছাড়া ইয়াকুব চৌকিদারের সঙ্গে মকবুলের কথোপকথনেও মুসলিমদের মানসিকতা ও পাকিস্তান হবার পর সেখানে হিন্দুদের অসহায়তার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। ইয়াকুবকে সঙ্গে নিয়ে পালঙ্ক ঘরে তুলবার সময় মকবুল ধলাকর্তা সম্পর্কে তাকে বলেছে — "শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার! মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মত সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম

নাই! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই, একটা জ্বালানি কুটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউখ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। সুরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে ? ছাইড়া দ্যাও মোনে।" মকবুলের এই বক্তব্যে দেশবিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে মুসলিমদের আধিপত্যের দিকটি যেমন প্রকাশিত তেমনি সংসারের প্রতিটি জিনিসের প্রতি ধলাকর্তার অপরিসীম মমতার দিকটিও প্রকাশিত। এরপর ইয়াকুব ও মকবুলের পরবর্তী কথোপকথনেও পাকিস্তানে ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রাধান্য ও মানসিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হল —

"ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়ে নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা মেঞাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ খাট আমি এমনই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।"

তবে দেশবিভাগের পরবর্তীকালে পাকিস্তানে এই মানসিকতাই সর্বত্র প্রাধান্য পায়নি। যে সকল হিন্দু মানুষেরা দেশভাগের পরেও পুরানো ভিটে মাটি ও ভিন্নধর্মী প্রতিবেশীদের আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের প্রতি অনেকের মনে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিও বর্তমান, ধলাকর্তাও এই শ্রেণির মানুষ তাই গেদু মুন্সী মকবুলকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করে বলেছে — "কাজটা তুমি ভালো কর নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমার তানার জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি।"

যাইহোক মকবুলের কাছ থেকে কোনভাবেই পালঙ্ক ফিরে না পেয়ে ধলাকর্তা কৌশলে তার কাজকর্মের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, যাতে মকবুল আর্থিক দুরবস্থায় তার পালঙ্ক বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। ধলাকর্তার অসহযোগিতায় মকবুলের দিনযাপন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, সপরিবারে অনাহারের মুখে পড়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু তবুও নিজের জেদ বজায় রেখেছে, শত প্রলোভন সত্ত্বেও ধলাকর্তাকে বা অন্য কারও কাছে সে পালঙ্ক বিক্রি করেনি। জীবনধারনের দুরূহ সংগ্রামে সে নিজের গরু বিক্রি করে দিয়েছে, নৌকা বিক্রি করে দিয়েছে, তথাপি অবস্থা তার ফেরে নি, বরং দিন দিন আগের থেকেও খারাপ হয়েছে। সকল কিছু নিঃশেষ হবার পর শুধু টিকে গেছে তার ঘর আর ঘরজোড়া পালঙ্কখানি। মকবুলের পরম দুরবস্থার কালে স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে তার কথোপকথনে দরিদ্র মানুষের অসহয়তার চিত্র পরিস্ফুট।

দেশভাগ, রাজনৈতিক পালাবদল ও পট পরিবর্তনেও যে দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে তা বোঝা যায় যখন ফতেমা বলে — "শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান ?" এর উত্তরে মকবুল চরম দুঃখ ও নৈরাশ্য নিয়ে বলেছে — "গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।"

মকবুল পালঙ্ক রক্ষা করবার জন্য যত জেদ করেছে অপরদিকে পালঙ্ক ফেরত পাবার জন্য ধলাকর্তাও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বাড়ির চাকর কালুকে, অধিক অর্থ দেবার প্রস্তাব দিয়ে মকবুলের কাছে পাঠিয়েছেন, মকবুল রাজি না হবার পরেও ধলাকর্তা নিরস্ত না হয়ে নিজেই বাসক পাতা আনবার ছল করে বার বার মকবুলের বাড়িতে গেছেন, দরজার ফাঁক দিয়ে হতাশা পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের পালঙ্কের দুরবস্থা দেখেছেন। চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় ধলাকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে মকবুলের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একের পর লোক এসেছে অধিক অর্থের লোভ দেখিয়ে তার পালঙ্ক কিনে নিতে। মকবুলও পেটের ক্ষুধা চেপে রেখে, ক্ষুৎ পিপাসাকে প্রাণপণে দমিয়ে রেখে অর্থের প্রলোভনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ধলাকর্তা তার আরাধ্য রাধাগোবিন্দের মূর্তির সামনে বসে একদিন প্রার্থনা করেছেন তার মায়ার বন্ধন কাটাবার জন্য, তার কামনা-বাসনা, লাঞ্ছনা ও অপমান দূর করবার জন্য। একদিন সহসাই পালঙ্কের প্রতি ধলাকর্তার মোহ অপসৃত হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় ধলাকর্তা গভীর রাতে একাকী উপস্থিত হয়েছে মকবুলের বাড়িতে আর মকবুল দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালাকে চেপে রেখে আতাজদ্দির প্রলোভনকে ফিরিয়ে দিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। ধলাকর্তা দেখলেন তার পালঙ্ক, আরও দেখলেন পালঙ্কের উপর শায়িত মকবুলের দুই শিশু সন্তানকে। মকবুল ধলাকর্তাকে তার পালঙ্ক খুলে দিতে চেয়েছে কিন্তু ধলকর্তা আর সে পালঙ্ক চাননা, পালঙ্কের উপর শায়িত মকবুলের সন্তানদের দেখে তার মনে হয়েছে যেন স্বয়ং রাধাগোবিন্দ সেখানে শুয়ে আছেন, স্বয়ং ঈশ্বর যেন মুহূর্তে তার বিষয় বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই স্থানে গল্পের সমাপ্তি। গল্পের অন্তিম বার্তা হয়তো ভিন্ন। কিন্তু ধলাকর্তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেশবিভাগের পরও যে সকল হিন্দু মানুষ প্রাণপণে নিজেদের বিষয় সম্পত্তিকে পাকিস্তানে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এবং গল্পের বিভিন্ন স্থানে দেশভাগের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি ও মানুষের বিশিষ্ট মানসিকতা যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে নরেন্দ্রনাথের দেশবিভাগ সম্পর্কিত গল্পের ধারায় 'পালঙ্ক'একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের সমাজবীক্ষা ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও তার পরবর্তী সময়কালে নরেন্দ্রনাথের লেখনী বিশেষরূপে

ক্রিয়াশীল ছিল। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত প্রভৃতি একের পর এক আঘাতে প্রচলিত বাঙালি সমাজের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছিল। শ্রমিক শ্রেণি যেমন কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল তেমনি গ্রাম্য কৃষি নির্ভর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষকেরাও হয়েছিল শহরমুখী। একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙন এবং জীবন ও জীবিকার তাগিদে পারিবারিক জীবনের সকল বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতা, সম্মানবোধ প্রভৃতির সংজ্ঞাও পাল্টে গিয়েছিল। বেঁচে থাকবার দুস্তর ও দুরন্ত প্রয়াসে কখনো পিতা মেয়েকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিক্রি করেছে, কখনো বা স্বামী স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছে পতিতাবৃত্তির দিকে, আবার কখনও নিরন্ন অসহায় স্ত্রীলোক জীবনধারণের প্রয়াসে নিজেই অবলম্বন করেছে দেহোপজীবিনীর বৃত্তি। মানুষের সকল মূল্যবোধের পরিসমাপ্তি ও নৈতিক অধঃপতনের চিত্র কিছু পরিমাণে ফুটে উঠেছে নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহেও। যদিও নরেন্দ্রনাথের মানসিকতার সঙ্গে অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রণের দিকটি ঠিক খাপ খায় না তবুও তাঁর 'চোরাবালি', 'রসাভাস', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিস্ফুট। এই শ্রেণির গল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মূল্যবোধের ভাঙন ও অবক্ষয়ের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমনি আবার অন্যদিকে এই ছোটগল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে নারীর আত্মাধিকার লাভের প্রচেষ্টা বা স্বাধিকার অর্জনের লড়াই এবং একে কেন্দ্র করে পারিবারিক নানা অশান্তি। এই ধারার কোন কোন গল্পে স্থান পেয়েছে নারীর অবনমন ও পদস্খলনের দিকটিও।

নরেন্দ্রনাথের অবক্ষয়িত সমাজচিত্রণের গল্পের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম 'চোরাবালি'। 'চোরাবালি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পূজা সংখ্যা 'কলিকাল' পত্রিকায়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। এই গল্পটির পূর্বনাম ছিল 'সংসর্গ', পরবর্তী সময়ে 'অসমতল' গল্পগ্রন্থে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চোরাবালি'। নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অসহায়তার দিকটি এবং তার কর্মজীবন ও অন্যান্য প্রবণতা কেমনভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তা পরিস্ফুট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'অবতরণিকা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে কর্মজীবনে প্রবেশকারী গৃহবধূর গৃহের গন্ডি অতিক্রমের পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'চোরাবালি' গল্পে দেখা যায় নারীর অসহায়তার চিত্র, যেখানে কখনও পিতার হাতে, আবার কখনও বা স্বামীর হাতে নারী ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে, সামাজিক অবক্ষয়ের ধারায় পুরুষের স্বার্থরক্ষার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে, নিজের সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে অসমর্থ হচ্ছে।

'চোরাবালি' গল্পের সূচনাতে দেখা যায় একই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাসকারী রাণুর প্রতি গৌরাঙ্গের অভব্যতার সীমা অতিক্রমকারী ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা — "মাসখানেক যাবৎ গৌরাঙ্গ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।" একই বাড়িতে ভাড়া থাকবার সুবাদে সুন্দরী রাণুর প্রতি মুখোমুখি

ঘরের ভাড়াটে গৌরাঙ্গ অত্যন্ত অন্যায়, অশালীন ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার করে, যা দেখে রাণুর বাবা অনাদি ক্রোধান্ধ হয়ে বলে— "ওকে মেরে যদি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে না দিই তো কায়েতের বাচ্চা নই আমি।" গৌরাঙ্গের ব্যবহারে রাণুর মা সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন, এমনকি গৌরাঙ্গের নিজের বিধবা মাও ছেলের ব্যবহারে অন্তরে লজ্জিত হন কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না। অপরদিকে যাকে লক্ষ করে গৌরাঙ্গের অশালীন ইঙ্গিত, চটুলগান ও অসভ্য দৃষ্টিপাত নিক্ষিপ্ত হয়, সেই রাণু গৌরাঙ্গের ব্যবহারে কখনও বা রাগান্বিত হয় কখনও বা কিছুটা কৌতুক উপভোগ করে, কিন্তু অনুরাগের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়না গৌরাঙ্গের প্রতি। বরঞ্চ নিজের বংশ গৌরবের প্রতি সচেতন রাণু পীড়িত হয় গৌরাঙ্গের অসংস্কৃত ব্যবহারে। গৌরাঙ্গের আচরণ দেখে রাণুর মনের অবস্থা লেখক ব্যক্ত করেছেন এইভাবে — "গৌরাঙ্গের কাণ্ড দেখে তার কখনো বা হয় রাগ কখনো বা পায় হাসি। অনুরাগ মুহূর্তের জন্যেও আসেনা। আসবার কথাও নয়, কেবল রঙটাই যা গৌরাঙ্গের ফরসা, কিন্তু এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে, চোখ দুটো কোটরগত, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের রঙ হয়েছে ঘন-কৃষ্ণ। দশ আনি ছ আনি চুলের ছাঁট, ঠোঁটের উপর গোফ রাখা সূক্ষ্ম রেখায়। এর পর একটা ছাই রঙের স্যুট পরে বেরোয় কাজে। যা চমৎকার দেখায় স্যুট পরলে ঐ চেহারায়। শুধু বাইরের নয়, লোকটির মনের চেহারাও যে অমনি তা তার হাব-ভাব আদব-কায়দায় রাণুর কাছে গোপন থাকে না। গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রতিটি পদক্ষেপ রাণুর দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, রুচিকে ক্লিষ্ট করে তোলে। আজই না হয় অবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু কমলপুরের বনেদী চৌধুরী বংশের তো মেয়ে। এক ঘর জ্ঞাতি এখনো জমিদারি করছে গাঁয়ে।"

এ হেন গৌরাঙ্গের প্রতি সবার মানসিকতা সহসা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, মিথ্যে বংশ গৌরবের গর্ব মুছে গেছে, আর এই অভাবিত অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হয়েছে গৌরাঙ্গের চাকুরিতে পদোন্নতির ফলে। রাণুর বাবা অনাদি ও গৌরাঙ্গ একই ইনস্পেকশন ডিপোতে একই টুলস্ সেক্সনে কাজ করেন। সকলকে বাদ দিয়ে সাহেব গৌরাঙ্গের প্রতিই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অনাদিদের সেক্সনের হেড একজামিনারের পদাভিষিক্ত করেছেন। অনাদিকে এখন গৌরাঙ্গের অধীনেই কাজ করতে হবে, শুধু তাই নয় খুব শিগ্‌গিরি অনাদির সুপারিনটেনডেন্ট হবারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এখন গৌরাঙ্গ অনাদির সহকর্মী মাত্র নয় বরং অনাদির উপরওয়ালা; অনাদির পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই এখন গৌরাঙ্গের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। গৌরাঙ্গকে খুশি করতে পারলেই অনাদির বেতনবৃদ্ধি হতে পারে, সম্ভব হতে পারে রাণুর ভাই প্রমথকে কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া। এই প্রয়োজনের তাগিদে সহসা গৌরাঙ্গের প্রতি অনাদি সহ রাণুর পরিবারের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। যে গৌরাঙ্গের হাড় গুঁড়ো করে দেবার ইচ্ছা পোষণ করতো অনাদি, যে গৌরাঙ্গের সামনে বের হওয়া নিষেধ ছিল রাণুর সেই গৌরাঙ্গের সঙ্গেই রাণুর বিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করেছে অনাদি। গৌরাঙ্গের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে রাণুর মা মৃদু আপত্তি করলে আশ্চর্যজনক ভাবে অনাদি

বলেছে— "পুরুষের আবার স্বভাব-চরিত্র। বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো। তা ছাড়া ওই রকমই চাই আজকাল,বুঝলে? ফাজিল-ফক্কর না হতে পারলে এই যুগে ভাত নেই"। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের মেয়েকে বলি প্রদত্ত করতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেনি অনাদি বরং নিজের সিদ্ধান্তকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা করেছে সে, তাই স্ত্রীকে বলেছে — "আর ভাব-সাব দেখে বুঝতে পারো না, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভালোবাসাও হয়েছে। আজকালকার এই তো নিয়ম, ভালোবাসার পর হয় বিয়ে"। কেবলমাত্র নিজের চাকুরিগত সুরক্ষাই নয় গৌরাঙ্গের সঙ্গে রাণুর বিয়ে দিলে অনাদির আর একটি লাভের দিকও আছে, কোনো দাবী দাওয়া, খরচপত্র ছাড়াই রাণুকে পাত্রস্থ করা যাবে, তাই এমন লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি অনাদি। পিতার এই ঘৃণ্য আচরণে ও নীচ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে হতবাক হয়ে গেছে রাণু, বিহ্বল রাণু প্রতিবাদ নিস্ফল জেনে পিতার ইচ্ছার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়েছে। এখানেই গল্পটি সমাপ্ত হতে পারতো কিন্তু লেখক মানুষের অধঃপতনের শেষ সীমাও যেন দেখাতে চান, মানুষের দ্বারা মানুষকে পণ্যে পরিবর্তিত করার চূড়ান্ত নির্মমতার দিকটি তিনি উদ্‌ঘাটন করতে ইচ্ছুক। তাই দেখা যায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে রাণুর। অনাদি রাণুকে ব্যবহার করে নিজের কর্মজীবনকে সুরক্ষিত করেছে আর এই ভাবে রাণু প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে তার পিতার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে।

বিবাহের পর ধীরে ধীরে রাণু গৌরাঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পিতার আচরণের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে পিতামাতার সামনেই গৌরাঙ্গকে বেশি বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করল। এই মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে পুরোনো বাড়ি ছেড়ে গৌরাঙ্গকে নতুন বাড়ি ভাড়া নিতে বাধ্য করলো। অপরদিকে গৌরাঙ্গও পরিবর্তিত হয়েছে, নিজের উদ্দাম লোলুপতাকে পরিত্যাগ করে রাণুকে নিয়ে সে সুখের সমুদ্রে ভাসতে চেয়েছে। এই কারণে যুদ্ধের বাজারে গৌরাঙ্গ ন্যায়- অন্যায় সকল পথেই অর্থ উপার্জন করতে মনোনিবেশ করেছে, আর তার এই কাজে সহায়তা করেছে তারই উর্ধ্বতন কর্তা মিঃ গোয়েন।

গৌরাঙ্গের সুপারিনটেনডেন্ট্ গোয়েনকে রাণু একদিন দেখেছে সিনেমা হলে। উল্টোদিকে গোয়েনও দেখেছে রাণুকে। তার দৃষ্টিকে রাণুর মনে হয়েছে — "ঠিক আগেকার গৌরাঙ্গের মত"। গোয়েনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে রাণুর প্রতি, কিন্তু গৌরাঙ্গ গোয়েনের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন, তাই সে রাণুকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছে গোয়েন সম্পর্কে। গোয়েনকে সে উল্লেখ করেছে সাক্ষাৎ শয়তান হিসেবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গৌরাঙ্গ সেই শয়তান গোয়েনেরই সহকর্মী হিসেবে একত্রে অবৈধ পথে অন্যায় অর্থ উপার্জনের দিকে পা বাড়িয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গৌরাঙ্গের মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, গৌরাঙ্গ জানে গোয়েন শয়তান কিন্তু — "জানলেই কি আর সব সময় মানতে পারা যায়, না

মানবার কথা মনে থাকে? তাছাড়া মানেও কি আর কথার বদলায় না যখন শয়তান আধা-আধি বখরা দিতে চায় ভালো মানুষকে?" অতএব দেখা যায় নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস আর আপসের পক্ষে যুক্তি সজ্জার সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে গৌরাঙ্গের মধ্যে।

অন্যায় ও অবৈধ কাজকর্মের ফলভোগ একদিন করতে হয়েছে গৌরাঙ্গকে। জেলে যাবার উপক্রম হয়েছে তার, আর এই বিপদের দিনে তার উদ্ধারকর্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে মিঃ গোয়েন। কিন্তু বিপদোদ্ধারের এই প্রয়াস শর্তসাপেক্ষ। রাণুকে একদিনের জন্য ভোগ করতে চায় গোয়েন। রাণুকে গোয়েনের সঙ্গে একদিন আধাআধি ভাগ করে নিলেই গৌরাঙ্গ রক্ষা পাবে জেলের ঘানি ঘোরানো থেকে। গোয়েনের এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া নিয়ে গৌরাঙ্গ দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু সেই দ্বিধা খুব স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয় তার মনে, সে মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলে। গোয়েনের প্রস্তাবে সে রাজি, কারণ — "সত্যি ঘানি তাকে কেন ঘুরাতে হবে? কি এসে যাবে? কেই বা জানবে?" গৌরাঙ্গের কাছে আশু বিপদ থেকে রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে আর সেই জন্য নিজের স্ত্রীকে অন্যের ভোগের সামগ্রী করে তুলতেও সে কোনো মানসিক বাধা অনুভব করেনি। এইভাবে দেখা যায়, একদিন রাণু পিতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, লোলুপ গৌরাঙ্গের হাতে তাকে তুলে দিয়ে তার পিতা নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস করেছে আর বিয়ের পর রাণু স্বামীর স্বার্থরক্ষায় স্বামীর উপরওয়ালার ভোগের সামগ্রী হতে চলেছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কন্যা রাণুর জন্য পিতা অনাদির ভাবনার সঙ্গে স্ত্রী রাণুর জন্য স্বামী গৌরাঙ্গের ভাবনার স্তর এক হয়ে গেছে। উভয়ক্ষেত্রেই অসহায় ক্রীড়নক হয়েছে রাণু।

রাণুর কাছে গৌরাঙ্গ গোয়েনের আগমনবার্তা দিলে রাণু অবাক হয়ে বলেছে, গোয়েন যে সাক্ষাৎ শয়তান, সে কেন আসবে, তখন গৌরাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে — "ঠাট্টা করেছিলাম। আসলে আমার খুব বন্ধুলোক, আসবে চা টা খাবে, একটু গল্পগুজব করবে, চলে যাবে। চমৎকার আলাপী, দারুণ ফুর্তিবাজ। দোষের মধ্য একটু ফাজিল। কিন্তু অমন ফাজিল ফক্কর না হতে পারলে আজকালকার দিনে চলে না,বুঝলে।" এই ভাবে গৌরাঙ্গের মুখের ভাষা আর অনাদির মুখের ভাষা এক হয়ে গেছে। যাকে মেরে হাঁড় গুড়ো করে দিতে ইচ্ছে হতো একদিন অনাদি তার হাতেই নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছিল এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য যুক্তি সাজিয়েছিল। অপরপক্ষে যে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান তারই ভোগের সামগ্রী হতে গৌরাঙ্গ নিজের স্ত্রীকে প্রেরিত করেছে এবং তারও যুক্তির অভাব হয়নি। উভয়ের যুক্তিই একই পথে গেছে, তাই রাণুর মনে হয়েছে অনাদির কণ্ঠই শুধু গৌরাঙ্গের সঙ্গে এক হয়ে যায়নি, গৌরাঙ্গের মুখের আদলও অনাদির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এইভাবে 'চোরাবালি' গল্পে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী কেমনভাবে পুরুষের হাতে ব্যবহৃত হয়, সেই পুরুষ কখনও হয় তার পিতা কখনও বা স্বামী।

নরেন্দ্রনাথ 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন — "সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে,

তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম।... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[২০] নরেন্দ্রনাথের এই নিজস্ব স্বীকারোক্তি ছাড়াও তাঁর রচনা পাঠ করলেই তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতার দিকটি আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। মহত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণে তিনি যখন মানুষের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র অঙ্কন করেন তখন সেই বর্ণনায় নির্মম হলেও স্খলিত ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা তাঁর থাকে, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রের পদস্খলনের জন্য বেদনাহত হন তিনি নিজেই। এই কারণে অনেকক্ষেত্রেই আমরা দেখি তাঁর অঙ্কিত চরিত্রেরা স্খলিত হবার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েও ঘুরে দাঁড়ায়, চরিত্র হননের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে চরিত্র মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। এমনই এক উত্তরণের গল্প 'রসাভাস'।

'রসাভাস' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫২ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা 'বসুমতী'তে। গল্পটির প্রথমে নাম ছিল 'বিষক্ষয়', 'অসমতল' গল্পগ্রন্থে লেখক এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'রসাভাস'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর উপর কন্ট্রোল ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল, এই সময় গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মহিলারা লুকিয়ে চাল নিয়ে তা বিক্রি করত কলকাতার গৃহস্থ বাড়িতে। এই অবৈধ 'ব্লাক মার্কেটিং' কে প্রতিরোধ করবার জন্য ছিল সরকারী গোয়েন্দারা। আইনের এই রক্ষকেরা অনেকক্ষেত্রেই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করত। অবৈধ চালের আদান প্রদানকে বন্ধ করবার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রেই এই চাল পাচারকারী মহিলাদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় করাই ছিল তাদের কাজ, অনেক সময় এই মহিলাদের সম্ভ্রমও ছিল তাদের উৎকোচের অংশ। সমাজের সর্ব অংশে সংক্রমিত এমন দুর্নীতির চিত্র লেখক 'রসাভাস' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রামের বধূ পদ্মমণি আকালের সময় স্বামী, শাশুড়ী আর ছেলের হাত ধরে শহরে আসে। শহর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, ভীতু পদ্মমণির বুক কাঁপত শহরের নাম শুনেই। শহরে গাড়ি ঘোড়া থেকে ভীতি ছিল তার, পথচারী মানুষের দৃষ্টি তাকে শঙ্কিত করত, লজ্জিত আর অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিত। কারও দিকে দৃষ্টি রেখে সে ভিক্ষে চাইতে পারত না। স্বামী, শাশুড়ি ও ছেলেকে আকালের শিকার হতে দেখে, পেটের জ্বালায় ধীরে ধীরে তার লজ্জা ভেঙেছে, ভয় ভেঙেছে, শুধু তাই নয়, নারীর শুচিতা সতীত্বকেও আর সে মহার্ঘ্য বলে মনে করতে পারেনি। মান-সম্মান, লজ্জা- শরম সম্পর্কেও পুরাতন ধ্যান ধারনা সে ধরে রাখতে পারেনি। পদ্মমণির এই রূপান্তরকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে — "তারপর পদ্মমণির আরও নানা রকমের ভয় ভাঙল, লজ্জা ভাঙল, ভাবল এ মুখ দেখাবে কি করে। শেষ পর্যন্ত দেখল কিছুতেই কিছু হয় না, সব সয়ে যায়। কে কাকে মুখ তুলে খোঁটা দিতে আসবে। প্রত্যেকের মুখেই তো কালি। সবাই

জানে সবারই হাঁড়ির খবর।"

রূপান্তরিত পদ্মমণি জীবন জীবিকার জন্য শহরে গিয়ে গোপনে চাল বিক্রি করবার পথ বেছে নিয়েছে। কুমুদিনীকে তার পাড়াতুতো বউদি শিখিয়ে দিয়েছে এই ব্যবসার ফন্দি ফিকির। খুব শিগগিরি সে এই ব্যবসায় পরিপক্বতা লাভ করেছে, মানুষকে চিন্‌তে শিখেছে, ভয়কে চেপে রেখে কাজ হাসিল করার কৌশল করায়ত্ত করেছে। পুলিশের গোয়েন্দাদেরও সে আর ভয় পায় না, সে জানে সিকি আধুলিটা ফেলে দিলেই তাদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গৃহস্থেরা ভয় দেখালেও সেই ভীতি প্রদর্শনের অন্তঃসার শূন্যতাও সে উপলব্ধি করতে পারে।

এমন করেই চলছিল পদ্মমণির দিন, একদিন বোনঝি সোহাগীকে তার স্বামী রেখে গেল পদ্মমণির কাছে আর সোহাগী একদিন বায়না ধরেছে শহর দেখবার। তাই পদ্মমণি একদিন চালের সঙ্গে সঙ্গে সোহাগীকেও নিয়ে এসেছে শহরে আর গোয়েন্দা মুকুন্দ শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই অনুসরণ করেছে তাদের। 'ব্লাক মার্কেটিং'-কে বন্ধ করা বা অবৈধ চাল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণই তার উদ্দেশ্য নয়। পদ্মমণির সঙ্গী সোহাগীই তার আকর্ষণের কেন্দ্র। লেখক মুকুন্দের বাসনাকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে — "পাঁচ ছয় জন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষ আর তাদের সঙ্গে সতের আঠার বছরের ওই মেয়েটি। ওর গায়ের রং সঙ্গিনীদের মত কালো হলেও চোখ নাক এত টানাটানা আর মুখের ডৌলটি এমন সুশ্রী যে, মুকুন্দের মনে হলে বহুকাল সে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এমন একটি সুশ্রী মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটল।"

সোহাগীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে মুকুন্দ তাই সিকি আধুলির বিনিময়ে পদ্মমণিদের নিষ্কৃতি দেয়নি বরং সারা শহরময় অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। যখন পদ্মমণি ভেবেছে যে সে পিছু ছাড়াতে পেরেছে গোয়েন্দাটির ঠিক তখনই পদ্মমণির এক পুরানো খদ্দেরের ফার্নিচারের দোকানের সামনে মুকুন্দ তাদের ধরে ফেলেছে। দোকানের মালিক হেরম্ববাবু নিজেকে ও পদ্মমণিদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। চা, পান ও সিগারেট খাইয়ে মুকুন্দকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে সে, কিন্তু মুকুন্দের লোলুপ দৃষ্টি তখন সোহাগীর দিকে। পদ্মমণির লুকিয়ে রাখা চাল সে বের করেছে, কঠোর কর্তব্যের দোহাই দিয়ে পদ্মমণিকে ধমক দিয়েছে কিন্তু চোখ রেখেছে সোহাগীর দিকে। লেখক লেখেন — "মুকুন্দ অপাঙ্গে একবার সোহাগীর দিকে তাকাল। আর একবার আলমারীর গ্লাসে প্রতিফলিত তার প্রতিবিম্বের দিকে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ফোঁটা, দুই ঠোঁট পানের রসে লাল টুক টুক করছে। কি চমৎকার ওর মুখের ডৌলটি, মুকুন্দ যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল।" এরপর মুকুন্দ পদ্মমণির কাছ থেকে চাল উদ্ধার করেছে, হেরম্ববাবুর কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও পাঁচ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছে কিন্তু পদ্মমণি ও সোহাগীকে ছেড়ে দেয়নি বরং থানায় জবানবন্দী দেবার জন্য তাদের নিয়ে চলেছে থানার দিকে। পদ্মমণি কিছু জরিমানা নিয়ে তাদের

ছেড়ে দেবার কাতর অনুনয় করলেও মুকুন্দ তাদের রেহাই দেয়নি বরং অন্ধকারে কিছুক্ষণ এগলি ওগলি ঘুরে, পদ্মমণিকে চলে যেতে বলেছে কিন্তু সোহাগীকে থানায় জবানবন্দী দেবার অজুহাতে রেখে দিতে চেয়েছে। চতুরা ও বহু অভিজ্ঞা পদ্মমণি মুহূর্তে মুকুন্দের অভিলাষ বুঝতে পেরেছে, তাই সোহাগীকে ছেড়ে সে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে। অসহায় অনভিজ্ঞা সোহাগীর আর্ত অনুনয় শুনে সে বরং নির্লজ্জের মত বলেছে — "আঃ অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ছুঁড়ী। তোকে কি যমের মুখে ফেলে যাচ্ছি না কি, ভয় কি, থানা পুলিশ তো আর কিছু হচ্ছে না। এ তো ভালই।" থানা পুলিশ অপেক্ষা সোহাগীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুক্তি লাভ পদ্মমণির কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে এরপর পদ্মমণি আরও বলেছে — "কোন লজ্জা করবেন না বাবু। মেয়ে কি ওতে মরবে না পচে যাবে? চোখের ওপর কত দেখলুম। কেবল একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন"। অর্থাৎ নারীদেহের শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি পদ্মমণির কাছে অর্থহীন, তা তার কাছে আদর্শবাদীর ফাঁপা ফানুস মাত্র। মুকুন্দ একজন নারীমাংস লোলুপ, স্খলিত গোত্র মানুষ, তাকেও স্তম্ভিত ক'রে পদ্মমণি এবার তার কাছে দাবী করেছে 'দস্তুরী'। সোহাগীর আপন মাসি ও একমাত্র গার্জিয়ান হিসেবে সোহাগীকে ভোগ করবার 'দস্তুরী' দাবী করেছে সে। পদ্মমণির নির্লজ্জ ব্যবহার ও নীতিহীন নীচতায় হতবাক হয়ে গেছে মুকুন্দের মতো মানুষ, সে বিশ্বাস করতে পারেনি যে সত্যিই পদ্মমণি সোহাগীর নিজের মাসি। মাসি হয়ে নিজের বোনঝিকে এক লোলুপ পুরুষের হাতে তুলে দেবার সানন্দ উৎসাহ ও সহায়তা করার পিছনে যে ঘৃণ্য মন ও মানসিকতা লুকিয়ে আছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুকুন্দ সহসা সম্বিত ফিরে পেয়েছে। নিজের পাপ ও দুর্বলতার বোধটি যেন তার মধ্যে সহসা সঞ্চারিত হয়ে তাকে আঘাত করেছে। মুকুন্দের লাম্পট্য— ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পদ্মমণির ততোধিক কলুষতা ও অর্থলালসার বিকৃত রূপের কাছে পরাস্ত হয়েছে, দুঃসহ ঘৃণায় মুকুন্দ উৎকোচ রূপে গৃহীত পাঁচ টাকার নোটটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে কশাহতের মতো পালিয়ে এলেছে কলুষতা থেকে। ভয়াবহ ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও মানুষের কল্যাণবোধ ও বিবেক যে নিঃশেষ হয়ে যায়না সেই দিকটিই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন 'রসাভাস' গল্পে। আপাত বীভৎসতার আড়ালে মানুষের কল্যাণবোধের জাগরণে গল্পটি রসোত্তীর্ণ।

নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই নারীরা সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে বেড়িয়ে এসে বৃহত্তর জগতে বা কর্মজগতে পা রেখেছে। সংসারের প্রয়োজনে বা আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য মেয়েদের এই স্বাধীন কর্মপ্রয়াস সেই সময়ে অনেক পরিবারে সমস্যা বা পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। বর্তমান কালে যে জিনিসটি খুবই স্বাভাবিক ও বহুল প্রচলিত, স্বাধীনোত্তর কালে সেই জিনিসটিই যথেষ্ট পরিমাণে কন্টকাকীর্ণ ছিল মেয়েদের পক্ষে। বাড়ির মেয়ে বা বউরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, এতদিনকার সংস্কার ও রক্ষণশীলতার পাথরপ্রতিম প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, বাইরের জগতের সঙ্গে

তাদের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু বহুদিন ধরে প্রচলিত পারিবারিক সম্পর্ক ও ছকটি যেন ভেঙে গেছে, রক্ষণশীল মানুষেরা যেন মেয়েদের এই বহির্মুখীনতাকে ঠিক যথার্থ মর্যাদা দিতে পারছে না – – এমন একটি পরিস্থিতি সেই সময় তৈরি হয়েছিল। বাড়ির মেয়ে বা বউদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশকে কেন্দ্র করে পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে যে তরঙ্গ জেগেছিল তাকে নরেন্দ্রনাথ অনেক গল্পেই রূপদান করেছেন। এমনই এক পারিবারিক তথা সামাজিক পালা বদল ও তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বের ও মানসিকতার সংঘাত লক্ষ করা যায় 'অবতরণিকা' গল্পে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তে প্রকাশিত এই গল্পটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্পটিকে নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'মহানগর' নাম দিয়ে উপন্যাসে বর্ধিত করেছেন এবং চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় গল্পটি নিয়ে 'মহানগর' নামক চলচ্চিত্রও তৈরি করেছেন। 'অবতরণিকা' গল্পের মূল বিষয় সুব্রতর স্ত্রী আরতির চাকরি গ্রহণ ও সেই বিষয় নিয়ে পারিবারিক শান্তির বিঘ্ন ঘটা। কিন্তু গল্পের মূল বিষয় এইটি হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান, রক্ষণশীল মানুষের প্রবল স্বার্থপরতা, পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি পূর্ববঙ্গের মানুষের অন্তরের যোগাযোগ, উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযাত্রার কঠোরতা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতা প্রভৃতি জিনিসও গল্পে ছায়া ফেলেছে এবং গল্পকে গড়ে তুলেছে।

সুব্রত ও তার স্ত্রী আরতি পূর্বপাকিস্তানের থেকে কলকাতায় আগত উদ্বাস্তু পরিবার। সুব্রতর বাবা প্রিয়গোপাল, স্ত্রী ও নাবালক তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় ছেলের কাছে চলে এসেছেন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে, কারণ পূর্ববঙ্গে জমিদারী সেরেস্তার চাকরি চলে গেছে তার, পাকিস্তানের হাঙ্গামা তার পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসাকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথমে প্রিয়গোপালের ইচ্ছে ছিল মাসদুয়েক থেকেই স্বস্থানে ফিরে যাবেন কিন্তু অর্থাভাব ও আলস্যবশত আর ফিরে যাওয়া হয়নি বরং বড় শহরে থাকবার স্বাদ পেয়ে সুব্রতর সংসারেই থেকে গেছেন। ফলস্বরূপ সুব্রতর একার আয়ের উপর সাত আট জন পোষ্যর ভার পড়েছে আর যে ভার একক ভাবে বহন করতে সুব্রত গলদঘর্ম হয়ে পড়েছে। সংসারে অভাব অনটন বৃদ্ধি পেয়েছে, বহু দিকে ব্যয় সংকুলান করেও সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে সুব্রতর পক্ষে। সুব্রত ও আরতির সংসারের বর্ণনায় লেখক তৎকালীন নিম্নবিত্ত উদ্বাস্তু মানুষের অর্থনৈতিক অসহায়তার চিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন — "অফিস থেকে যা মাইনে পায়, তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হয় না। ফলে পরের দুই সপ্তাহের রেশন আর বাজারের টাকাটা সংগ্রহ করতে প্রতিমাসে প্রাণান্ত হয় সুব্রতর। সংসারে রোজগেরে সে একা হলেও পোষ্য অনেক। নিজেরা স্বামী-স্ত্রী, আর দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা আর ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। ভাই দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে। উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দু'খানা ঘর। তারই ভাড়া গুনতে হয় মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সংসারিক খরচ ছাড়াও অসুখ-বিসুখের খরচ

আছে। লোক-লৌকিকতাও কিছু না দেখলে চলে না। ফলে প্রতি মাসে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক ভারী হয়ে ওঠে।"

সাংসারিক কারণেই সুব্রত প্রথমে আরতিকে কোনো চাকরি জোটানোর জন্য উৎসাহ জুগিয়েছে। নিজের বন্ধুর স্ত্রীদের চাকরির খবর শুনিয়েছে আরতিকে। কখনো পরোক্ষে কখনো বা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছে সে নিজের মনের কথা। নিজের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত ব্যাখ্যা করেছে বর্তমান পরিস্থিতিকে — "পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো ? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"

সুব্রতকে সাহায্য করবার জন্যই আরতি প্রাথমিক দ্বিধা ত্যাগ করে চাকরির সন্ধান করেছে। এতদিন সে সংসারের ব্যয় সংকোচ করবার চেষ্টা করেছে, নতুন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবার সে চেষ্টা করেছে ব্যয় কমানোর পরিবর্তে আয় বাড়ানোর। দৈনিক কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন পাঠানো শুরু করে আরতি আর তার এই কাজে সহায়ক হয় সুব্রত। চাকরির জন্য চেষ্টা চরিত্র করতে থাকলেও মানসিক দ্বিধার কারণে এ প্রচেষ্টা চলে আরতির শ্বশুর শাশুড়ীকে গোপন করেই। একের পর এক দরখাস্ত করতে থাকে আরতি কিন্তু ইপ্সিত ফললাভ হয় না। হঠাৎ একদিন মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানি থেকে নিয়োগপত্র আসে আরতির নামে, শিক্ষায়িত্রী বা কেরাণীর চাকরি নয়, সেলাই মেশিনের বিক্রয় ও ডেমনেস্ট্রেসনের কাজ। কাজটি আরতির কাছে যথেষ্ট সম্মানজনক মনে হয়নি কিন্তু মাইনের পরিমাণটি সেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করেছে। চাকরির নিয়োগপত্র পাবার পর আরতির প্রথম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীকে খবরটি জানানোকে কেন্দ্র করে। সে নিজের মুখে খবরটি জানাতে পারেনি তাই সুব্রত সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী কেউই সংবাদটি ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেনি। বাড়ির বউ-এর চাকরি করাকে বাবা-মা সহজে মেনে নেবে না একথা সুব্রত ও আরতি উভয়েরই অজানা ছিল না তাই এতদিনের চাকরির দরখাস্ত প্রেরণ ও ইন্টারভিউ দেওয়া সবই চলেছিল গোপনে, কিন্তু প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী আরতির চাকরি লাভের ঘটনায় মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং সে সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অস্বাভাবিকও নয়। চাকরির খবর পেয়ে প্রিয়গোপালের সুপ্ত বংশমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয়েছে। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সুব্রতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন— "একথা তুমি উচ্চারণ করলে কি ক'রে ভোম্বল। আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব ?" অতএব দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক কারণে প্রিয়গোপাল দেশে ফিরে যেতে পারছেন না, নিজের নাবালক তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় ছেলের আশ্রয়ে বাস করছেন, তথাপি বাড়ির বউ-এর চাকরি করা তার কাছে অপমানকর বলে বোধ হয়েছে। শাশুড়ী সরোজিনীও আরতির চাকরি

গ্রহণকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেননি তাই তিনি সুব্রতর আশ্রয় ছেড়ে পটলডাঙ্গায় তার বড় ভাইয়ের বাসায় চলে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। সুব্রত প্রথমে বাবা মাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, নিজের বন্ধু বান্ধবদের চাকরিরতা স্ত্রীর উদাহরণ দিয়েছে কিন্তু প্রিয়গোপাল নিজের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করেননি বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন — "যারা করে, তারা করুক। আমাদের বংশে ওসব কোনদিন হয়নি, হবেও না।" সুব্রতও নিজের জেদ বজায় রেখেছে, বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং শেষ পর্যন্ত একার পক্ষে তার এত বড় সংসার চালানোর অপারগতার কথা ঘোষণা করেছে। উত্তরে প্রিয়গোপাল নিজের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে তিনি নিজে স্ত্রীকে চাকরি করতে না পাঠিয়েও অত্যন্ত কম বয়সে এক সুবৃহৎ সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত সুব্রতর জেদ বজায় থেকেছে, আরতি চাকরিতে যোগদান করেছে কিন্তু প্রিয়গোপাল আরতির কাজে যাবার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীরব প্রতিবাদ করেছেন, দুঃখ ও অভিমানে সরোজিনীর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে। আরতির নিজের কাছেও কাজে যোগদানের দিনটি সংকোচে পরিপূর্ণ। শ্বশুর-শাশুড়ীর খাবার পূর্বেই স্বামীর পাতে খেয়ে নিতে আরতি অস্বস্তি বোধ করেছে, ছোট ছেলে আর মেয়ের ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত দিন তার কানে বেজেছে।

ধীরে ধীরে সমস্তটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, আরতির অস্বস্তিবোধ কেটে গেছে, সরোজিনীও হেঁসেল সামলানোর দায়িত্বকে ভবিতব্য বলেই যেন মেনে নিয়েছেন। পরিবর্তন আরো হয়েছে, ঘরের বাইরে আরতির আর একটা জগৎ হয়েছে, যেখানটা পূর্ণ হয়ে আছে অফিসের কর্মচারী, বস, সহকর্মী ও কাস্টমারদের দিয়ে।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আরতি পরিবারের সকলের জন্যই কিছু না কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, বাচ্চাদের জন্য লজেনস্ আর লেবু, শাশুড়ীর জন্য জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য আঙুর, স্বামীর জন্য সিগারেট, নিজের জন্য ব্লাউজের কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু এসব আনার জন্য সে মাইনের টাকা খরচ করেনি বরং মাইনের উপর সেলাই মেশিন বিক্রির কমিশন আরতি ও তার সহকর্মীরা আদায় করেছে এবং সেই টাকাই ব্যয় হয়েছে বাজার করার কাজে। অদ্ভুত মানুষের মন তাই সুব্রত বহুদিন পর ভালো সিগারেট খেতে পেলেও তার মন তিক্ত হয়ে গিয়েছে। সে নিজে অফিসের পুরো মাইনে বাড়ি আনতে পারে না, কিন্তু তার স্ত্রী আরতি তা পেরেছে বরং মাইনের উপর অতিরিক্ত কমিশন লাভ করেছে — এব্যাপারটিতে সুব্রত যেন কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে, যদিও তার মনে হয়েছে আরতির একটু 'কর্মাশিয়াল গন্ধ' মাখানো কথাবার্তা তার বিরূপতার কারণ। অপরদিকে আরতি যখন শ্বশুড় প্রিয়গোপালকে মাইনের টাকা দিতে গেছে তখন তিনি মুহূর্তকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলেছেন এ তার অপমান। নিজের জন্মদিনের দিন তিনি পুত্রবধুর নিকট থেকে প্রণামীস্বরূপ কিছু নিতে অস্বীকার করে বলেছেন — "...আজ

আমার মৃত্যুদিন। যত মধুর ক'রেই বল না মা, ওটা প্রণামী না, ঘুষ।"

পুত্রবধূ আরতির চাকরির প্রতি প্রিয়গোপালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিথ্যে অহং ও ফাঁকা বংশমর্যাদার প্রতি গৌরববোধ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। জমিদারী সেরেস্তার কাজে প্রিয়গোপাল প্রজাদের কাছ থেকে, তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে সিকিটা আধুলিটা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, প্রচলিত দস্তুর অনুসারে নিজের ন্যায্য পাওনা বলেই গ্রহণ করেছেন যদিও সেই পাওনার স্বরূপ তার কাছে অগোচর ছিল না। কিন্তু সেই প্রিয়গোপাল পুত্রবধূর দেওয়া প্রণামী স্বরূপ মাইনের টাকা গ্রহণ করতে পারেননি। অন্যায় অর্থ গ্রহণে তার সংকোচ ছিল না, কিন্তু ন্যায়সংগত অর্থ গ্রহণে তার বিরাগ, কারণ সেটি তার পুত্রবধূর উপার্জিত। পুরুষের অসহায়তা সত্ত্বেও নারীর দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণে যেন পৌরুষের অবমাননা — পুরুষতন্ত্রের এই বোধটি সম্ভবত সেই সময়ে নারীদের কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল।

আরতির চাকরিগ্রহণের ফলে সংসারের চেহারা বদলে গেছে। পূর্বের থেকে সংসার সচ্ছল হয়েছে, সব সময়ে বাইরের কাজ করবার জন্য ঝি রাখা হয়েছে, সুব্রত বোন নীলাকেও স্কুলে পড়বার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া একত্রে কাজে যাবার সময় বাসযাত্রায় সুব্রত আরতির সান্নিধ্যে পানসে হয়ে যাওয়া প্রেমের পূর্ব রোমাঞ্চ পুনরায় অনুভব করেছে। আরতিরও পরিবর্তন হয়েছে, তার গানের সখ, সেলাইয়ের সখ, মাসিক পত্রিকায় গল্প পাঠের সখ আর নেই বরং সে পুরো দস্তুর কর্মী হয়ে উঠেছে তার অফিসের।

কিন্তু চিরদিন পরিবারে সুখের পরিবেশ বজায় থাকে না। আরতির স্বাধীনতা, বাইরের লোকের সঙ্গে মেশা, ট্রামে-বাসে যাতায়াত প্রভৃতি সকলে ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না। পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় আগত সুব্রতদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাড়ি বয়ে এসে হয়তো খবর দেয় যে, কোনো এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আরতি রেস্টুরেন্টে চা খাচ্ছিল। এই বিষয়টি বর্তমান কালে কারও কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কিন্তু এই গল্পটি যে পটভূমিতে লেখা সেই সময়ের নিরিখে বিচার করলে সে আলোড়নের মাত্রাটি ধরা পড়ে। সুব্রত এই ব্যাপারে আরতিকে প্রশ্ন করেছে, যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছে, তথাপি মানসিকভাবে অস্বস্তিবোধ করেছে। অর্থ উপার্জনে আরতির মনোযোগকে সুব্রতর মনে হয়েছে 'স্থূল ব্যবসায় বুদ্ধি'। আরতির অনুপস্থিতিতে সাংসারিক কাজে অসুবিধে ছাড়াও সুব্রতরও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার অভাব হয়, বউয়ের সেবা ঝি-এর কাছ থেকে পেতে তার মন বিরক্ত হয়, তার মনে হয় আরতির বস মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানীর হিমাংশু মুখার্জী যেন আরতির কিছু অংশ সুব্রতর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন — "স্ত্রীর দেহমন তারই। কিন্তু দৈহিক শ্রমের দশ আনার শরিক হিমাংশু মুখার্জী।" সুব্রত হিমাংশু বাবুর সঙ্গে দেখা করে আরতির কাজে অসুবিধার কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু তার মুখোমুখি হয়ে কিছুই বলতে পারেনি বরং হিমাংশুবাবুই উল্টে সুব্রতর অভিযোগের কথা নিজের ভাষায় বলে দিয়েছেন।

এই গল্পের আলোচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে বাড়ির মেয়েদের বাইরে চাকরি করা নিয়ে যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব তাই গল্পের মূল সংকটকে গড়ে তুললেও এই বিষয়টি ছাড়াও 'অবতরণিকা' গল্পটিতে আরও কয়েকটি মাত্রা আছে। আর এই মাত্রার একটি হল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতার দিকটি। মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানীর হিমাংশু মুখার্জী ও সুব্রত উভয়েই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তাই তাদের কথোপকথনে পূর্ববঙ্গের মানুষদের প্রতি একটু অধিক পরিমাণে পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠেছে। সুব্রতরা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বলে হিমাংশুবাবু আরতির কাছে তাদের ভালই খোঁজখবর নিয়েছেন আর সুব্রতও পূর্ববঙ্গের লোক পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করে ব্যাপারটি দেখানো যেতে পারে-

"... 'আমরাও পূর্ববঙ্গের মানুষ মশাই। অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচের ধার ধারিনে। দেশের মানুষ দেখলে রেখে ঢেকে আলাপ করতে জানিনে। একেবারে প্রাণ খুলে দিই।'

সুব্রত খুশি হল ঃ 'ও আপনিও পূর্ববঙ্গের ? কোন জেলার ?'

সিগারেটের কৌটা এগিয়ে দিতে দিতে হিমাংশুবাবু হাসলেন, 'খোদ ঢাকার। আপনাদের বাড়িও তো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে ? সবই শুনেছি।'....

....হিমাংশুবাবু আর একবার আত্মপরিচয় দিলেন, 'সব বাঙাল মশাই, কোন চিন্তা করবেন না। বাঙালে বাঙালে ছেয়ে ফেলেছি আমরা, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় বার আনি তুলে আনতে হল পাকিস্তান থেকে। কিন্তু চুপচাপ বসে তো আর থাকা যায়না হাত পা কোলে ক'রে। ভাবলাম দেখি কপাল ঠুকে, আর ঢিল ছুঁড়ে। ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমরা পূর্ববঙ্গের লোক তো কোনদিন পিছ-পা নই। আর পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়া হঠাৎ মেয়েদের জন্য এমন একটা নিউ এভিনিয়ু কেই-বা খুলতে সাহস করত ? পূর্ববঙ্গের লোক না হলে আপনিই কি এত সহজে পাঠাতেন আপনার—'।"

এছাড়া আরেকটি দিক থেকে তৎকালীন সময়ে মেয়েদের বেশবাস ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতাও গল্পে ফুটে উঠেছে। আরতির এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলিগ বর্তমান যার নাম এডিথ সিমনস্। এই এডিথকে গল্পে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি, আরতির কথোপকথনেই এই চরিত্রটি সুব্রত ও আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এই চরিত্রটি গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু এছাড়াও ঐ এডিথ সম্পর্কে সুব্রতর মানসিকতার প্রকাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রতি সাধারণ বাঙালি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মেয়েদের সাজ পোশাকের প্রতি সাধারণ মানসিকতাটি প্রকাশিত হয়। গল্প থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে, — "বয়সে আরতির চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু এমন সেজে-গুজে আসে যে ছোট দেখায়। আরতির কাছে তার রূপ-বর্ণনা শুনতে

শুনতে বেঁটে, কালো, ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক আর আঙুলের নখে পালিশ লাগানো একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের রূপ সুব্রতর চোখে ভেসে ওঠে।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয়, 'খবরদার ওসব মেয়ের সঙ্গে মোটেই মিশবে না।"

— এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় এডিথের শুধুমাত্র সাজসজ্জার কথা শুনেই সে যে মন্দ মেয়ে সে সম্পর্কে সুব্রত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আবার সুব্রতর ভাবনা থেকেই পরিষ্কার যে ঠোঁটে লিপস্টিক ও আঙুলের নখে পালিশ লাগানো সেই সময় মন্দ মেয়ের লক্ষণ ছিল। সুব্রত ছাড়া হিমাংশু মুখার্জীও এডিথকে সুনজরে দেখেননা, এ দিকটিও গল্পে দেখা যায়। এই কারণে তাই কাস্টমারদের বাড়ি থেকে ফিরলে হিমাংশুবাবু তাকে কড়া কথা শোনান এবং অফিসে না এলে তার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতে এমনকি তাকে ''খারাপ টাইপের লুজ মরাল্‌সের মেয়ে'' বলতেও তার বাধেনা।

গল্পের এই দুটি ভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এবার আরতির কর্মজীবনকে ঘিরে তার পরিবারে যে আলোড়নের জন্ম হয়েছে সেই দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও দেখা গেল যে, আরতির চাকরির জন্য সুব্রত একদিন অতিশয় আগ্রহ দেখিয়ে ছিল, এমনকি বাবা মায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আরতিকে চাকরি করতে দিয়েছিল, সেই সুব্রত আরতিকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দিতে লাগল। নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য সুব্রত পার্টটাইম কাজ যোগাড় করল এবং ইন্সিওরেন্সের এজেন্সির কাজ পুনরায় শুরু করে দিল কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও আরতি কাজ ছেড়ে দিল না বরং সুব্রতর চরম অসহযোগিতা ও অপমানের পরেও সে অফিসে যাওয়া বজায় রাখল। পারিবারিক সম্মান ও শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে সুব্রত চেয়েছে আরতিকে বিরত করতে, আরতি তার কথা না শোনায় আরতিকে মারার জন্য তার হাত নিস-পিস করলেও সে সংযত করেছে নিজেকে। এ বিষয়টিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য ও নারীর অসহায়তার দিকটি প্রকাশিত। আরতিকে কাজ ছাড়াতে না পারায় অস্থির সুব্রত নিজের শ্বশুরকে ডেকে এনে আরতির নামে নালিশ করেছে এবং পৃথক হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে আর আরতির বাবাও সুব্রতর কথাতেই সহমত জানিয়েছেন। এমন পরিস্থিতি সহসা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে, আচমকা একদিন সুব্রতর ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, রাতারাতি বেকার হয়ে পড়েছে সুব্রত। স্বাভাবিকভাবেই আরতির একার রোজগারের উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে সংসার। ফলে অফিসের কাজে সামান্য রাত হলে যেখানে প্রিয়গোপাল, সরোজিনী, সুব্রত সকলেই কটু কথা শোনাতেন, বিরক্ত হতেন, আজ তারা নিজের স্বার্থের কারণেই চুপ হয়ে গেছেন। লেখক বলেন — "অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রির কমিশনের জন্য টালা থেকে টালীগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন কথা বলে না।" এডিথের সঙ্গে মিশতে মানা করেছে সুব্রত, তাই এডিথের সঙ্গে আরতিকে দেখলে সুব্রত ভাবে আরতিকে কিছু বলবে কিন্তু বলে না। বরং ভাবে — "আগে চাকরি জুটুক একটা।" একদিন সুব্রত আরতিকে বলেছিল— "সংসারের প্রয়োজনে

তোমাকে আমিই চাকরি নিতে বলেছিলাম, আবার দরকার বুঝে আমিই তোমাকে ছাড়তে বলছি। চাকরি তোমাকে ছাড়াতে হবে।" যেন আরতির চাকরি করা ও না করা সম্পূর্ণ ভাবে সুব্রতর ইচ্ছাধীন, পুরুষের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস যেন পরিলক্ষিত হয় এখানে, কিন্তু, সেই কর্তৃত্ব কায়েমে প্রয়াসী সুব্রতও অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই সুব্রত কোনো খদ্দেরের দ্বারা আরতি অপমানিত হলেও তা সয়ে গিয়ে আরতিকে সে সাবধান করে বলে — "খবরদার' এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের। সাবধানে, খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে আমাদের।" সংসারে আবার অনটন শুরু হয়, ঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, চারিদিকে ব্যয় সংকোচ করা হয় যথাসাধ্য। তথাপি আরতির একার রোজগারে সমস্ত খরচ কুলিয়ে ওঠে না, তাই সুব্রতও ঘরের কাজে হাত লাগায়, আরতিকে কাজ ছাড়িয়ে দেবার জন্য চাপ দেওয়ার বদলে সুব্রত বলে — "দেখ যেন লেট্- ফেট্ না হয়। এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।" এই ভাবে দেখা যায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের চরিত্রেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, পারিবারিক সম্মানবোধ, ঐতিহ্য সকল কিছু চাপা পড়ে গেছে, বরং প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আত্মরক্ষার তাগিদ ও একই সঙ্গে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা।

এরপর ঘটেছে এক বিশেষ ঘটনা যা আমাদের পারিবারিক জীবনের মানুষগুলির চরিত্রের মূল দিকটিকে প্রকাশ করে। এক সামান্য ঘটনায় হিমাংশু মুখার্জী এডিথের অবর্তমানে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত অবমানকর কথা উচ্চারণ করেন। উপস্থিত কেউ তার প্রতিবাদ না করলেও আরতি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং হিমাংশুবাবু তার কথা উইথড্র না করায় সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। যে কাজ আরতির প্রাণ ছিল, যার জন্য সে সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করেছে সেই কাজ অপর একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। আরতির এমন আদর্শবাদীতার দিকটি কিন্তু সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে। প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী আরতির চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য আরতিকেই দোষারোপ করেছেন, দোষ দিয়েছেন তার মেজাজ ও গোয়ার্তুমিকে, মনিবের কথা অকুণ্ঠে স্বীকার করে নেওয়াই তাদের কাছে শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের মতে — "সত্যিই তো কোথাকার না কোথাকার একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। ওরা তো ওই ধরনেরই হয়। কাজের গাফিলতির জন্য মনিব যদি চটে গিয়ে দুচার কথা তার সম্বন্ধে বলেই থাকে তো কি হয়েছে ? দোষ দেখলে তাঁরা বলেন না তাদের ঝি চাকরকে ? যে গুরু দুধ দেয় তার চাঁটও সয়।চাকরি করতে গেলে মনিবের মেজাজ বুঝে চলতে হয় বৈকি। তা ছাড়া আরতিকে তো হিমাংশু কিছু বলেনি। বলবে কেন, একই জেলার লোক, জাতে একই বামুন, বলতে গেলে আত্মীয়ের মত।" এমনকি সুব্রতও আরতির সেন্টিমেন্টাল বাঙালিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছে। কারও কাছ থেকেই সমর্থন না পেয়ে আরতি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে এবং এখানেই গল্পের সমাপ্তি। অসাধারণ এই গল্পটিতে এই ভাবে একের পর এক উঠে এসেছে মেয়েদের

কর্মজীবনে প্রবেশকে ঘিরে পারিবারিক অশান্তির চিত্র, পুরুষের বিচিত্র ঈর্ষা বিজড়িত কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিথ্যে অহংকার, দম্ভ ও ফাঁকা বংশ গৌরবের অহংকার।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্প ও কিশোর গল্প ঃ

সকল গল্পকারই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার পুঁজিকেই গল্প লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সংমিশ্রণেই বাস্তব গ্রাহ্য প্রতীতির জন্ম। সেই হিসেবে সব গল্পকেই গল্পকারের অভিজ্ঞতাজাত গল্প বলা যায় তবে এই অংশে আমরা আলোচনা করব সেই সকল গল্প যে গল্পের বিষয় সমূহ উঠে এসেছে নরেন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর রচিত কিশোর গল্পগুলি এই ধরনের রচনার সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ। কিশোর গল্পগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ নিজের কিশোর জীবনের কাহিনি গল্পাকারে বিবৃত করেছেন, নিজের ভাই, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনেরা সেখানে স্বনাম ও স্বমহিমায় বিরাজমান। এইসব গল্পগুলিতে কিশোর চরিত্র সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের জীবনভাবনাটি পরিস্ফুট হয়। নরেন্দ্রনাথের 'কিশোর গল্প সমগ্র' এর ভূমিকায় তাঁর পুত্র তথা গ্রন্থটির সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র লেখেন — "প্রথম ষোলটি গল্প লেখকেরই ছোটবেলার গল্প, যা বলতে গিয়ে তিনি ছদ্মবেশ এমনকি ছদ্মনামের আড়ালটুকুও রাখেননি। ছোটবেলার জগৎ যেন নিজেই এক গল্প।"[২১] এছাড়াও এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পেও তিনি পরোক্ষভাবে বর্তমান। এই ব্যক্তিজীবনের কিশোর গল্পগুলির মধ্যে 'কুমির', 'গুপ্তচর', 'কুশল', 'অনাথের কীর্ত্তিকলাপ', 'ময়ূরপঙ্খী', 'নষ্টচন্দ্র', প্রভৃতি গল্পগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই কিশোরগল্প ব্যতীতও বেশ কিছু গল্পে নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই গল্পগুলিতে হয়তো লেখক স্বনামে আবির্ভূত হননি কিন্তু ব্যক্তিজীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাটি সেখানে পরোক্ষভাবে উপস্থিত থেকেছে। 'নেতা' গল্পটিকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই নরেন্দ্রনাথ সামরিক অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছিলেন। কাজটি ছিল সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেবার , আর এখানে নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করতেন বালতি। ধীরেন্দ্রনাথ দাদার এই কাজকে বলেছেন, "বালতি টেপার চাকরি।"[২২]। এই অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করবার অভিজ্ঞতাকে তিনি বেশ কিছু গল্পে পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'চোরাবালি' গল্পটিতে কাহিনির দুই প্রধান চরিত্র গৌরাঙ্গ ও অনাদি এইরকম এক ফ্যাক্টরিতেই পরীক্ষকের কাজ করে। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণায় লেখেন — "যার কোনো জিনিস সম্পর্কেই জ্ঞান নেই তার উপর ভার পড়ল জিনিস বেছে দেবার। দাদার বস্তুজ্ঞান কম থাকলেও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ কম ছিল না। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে দাদা কিছু ভালো গল্প ধরে আনল।"[২৩] এই 'কিছু গল্প ধরে' আনার আলোকেই 'নেতা' গল্পটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্পের স্থানাভিষিক্ত হয়, কারণ 'নেতা' গল্পটির পটভূমিকা ও চরিত্রেরা

প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে লেখকের একসময়ের কর্মস্থল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে।

'নেতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অরণী' পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। মানুষের মনোলোকের গহনে বিচরণকারী নরেন্দ্রনাথ সামান্য একটি কাহিনিসূত্রকে বা ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এখানে উদ্ভাসিত করেছেন জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাধ্যতামূলক অধঃপতন এবং এর মধ্যেই কৌতুককর ভাবে নিজের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসের দিকটি। মেরুদণ্ডহীন মানুষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মনোগত ইচ্ছা আবার একই সঙ্গে পরিস্থিতির চাপে ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার কাহিনি 'নেতা' গল্পের মূল।

উত্তমপুরুষীয় রীতিতে রচিত এই গল্পের কাহিনি অংশ সামান্য। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরীক্ষকদের দলে গল্পকথক ভিন্নও রয়েছেন চন্দ্র চাটুয্যে, শিবু, বিপিন, রমেশ প্রভৃতি নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের দল এবং "পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন পদের সামরিক উপাধিধারী একেক জন শ্বেতাঙ্গ।" শ্রমিক দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্র চাটুয্যে কাজ করে সামান্য। তার মূল দায়িত্ব এই দলের উৎসাহ বর্দ্ধন করা, আদিরসের গল্পের স্রোতে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই গল্পের নেশায় সাহেবকে লুকিয়ে চন্দ্র চাটুয্যের কাজ অন্যান্যরা ভাগ ক'রে করে দেয়। আদিরসের এই ফেনিল উচ্ছ্বাসকে রুচি সম্মত করবার গল্পকথকের একক প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে "চাটুয্যের রসস্রোতে"।এই নেশা লাগানো গল্প সকল শ্রমিককে প্রমত্ত করে রাখে। এ হেন চন্দ্র চাটুয্যের কাজে ফাঁকি দেওয়া ও গল্পে মত্ত থাকা চোখে পড়ে গিয়েছে বড় সাহেব ক্যাপ্টেন উইলসনের। উইলসন চন্দ্রকে এক রোজের বেতন জরিমানা করেছে। অসহায়ভাবে চাটুয্যে জরিমানা রদ করবার জন্য কৃপাভিক্ষা করেছে ক্যাপ্টেনের কাছে, তার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বলেছে—"একেবারে ম'রে যাব-একেবারে ম'রে যাব স্যার।"

সাহেব চলে যেতেই জেগে উঠেছে চাটুয্যের ব্রহ্মরক্ত, একই সঙ্গে জেগে উঠেছে মধ্যবিত্তের বিপ্লবী মনুষ্যত্ব। তার জরিমানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সে সবাইকে বলেছে — "এ ফাইন রদ কর। আর বুড়ো ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছের বাচ্চা সকাল বেলায় যে অপমানটা ক'রে গেল তার শোধ তোল।"

বিদ্যা-বুদ্ধিতে নেতৃত্ব প্রাপ্ত কথক এবার সত্যি সত্যি নেতা হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী মানসিকতার জাগরণে, অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে আত্মবলিদানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সবাই। কিন্তু সেকসন ইনচার্জ ডসন সাহেব যখন এই 'বিদ্যার জাহাজ', 'বুদ্ধির সাগর' নেতাজী তথা গল্প কথককে ডিসচার্জ করেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে চাটুয্যে সহ বাকি সকলেই বিনা প্রতিবাদে সাময়িক কর্মবিরতি সমাপ্ত ক'রে হাতে বালতি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পূর্বেই যে ক্ষণস্থায়ী চাকরিকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অন্যায়ের প্রতিবাদ কল্পে সবাই একজোট হয়েছিল তাদের সেই সংকল্প অতি সহজেই ভেঙে

পড়েছে। মানুষের দুর্বলতা, নীচতা, হীনতা, ইতরতা ও লোভ গ্রাস করেছে মহৎ সংকল্প, মহত্ত্ব ও সাধু উদ্যোগকে। মেরুদণ্ডহীন মানুষ সামান্য আঘাতে গুটিয়ে গিয়ে কেন্নো হয়ে গেছে। যার উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক নেতা চাকরি খোয়ালেন, সেই চন্দ্র চাটুয্যে নিজের আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে লজ্জাহীনভাবে — "আরে বাবা, ওটা স্থানমাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভটচায্ যা বলেছে — আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায্ও যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তা'হলে তার ফলাফল দেখে ভটচায্ও ঠিক তোমাদের মতই একটা ক'রে বাকেট হাতে তুলে নিত। নেতাগিরি জিনিসটাই আসলে এই। নেতা কেউ নিজের ক্ষমতায় হয় না, অবস্থা গতিকে ধ'রে বেঁধে একেকজনকে নেতা আমরা বানিয়ে বসি। সেটা তার কপাল জোরও বটে, গ্রহ বৈগুণ্যও বটে।"

ভীরু, কাপুরুষ শ্রমিকদের নিকট থেকে চন্দ্র চাটুয্যের বক্তব্যের সমর্থনও পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে— "ঠিক বলেছেন, চাটুয্যেদা ! অবিকল তাই।"

মধ্যবিত্তের বিপ্লবী মনুষ্যত্বকে সস্তায়, প্রয়োজনের বেদিতে বলিদান দিয়ে আত্মসর্বস্ব, অর্থান্বেষী, সুখবাদী স্খলিতগোত্র মানুষের অধঃপতন এবং তারই মধ্যে সংগ্রামের প্রেরণা, এই নিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটেনি। জীবনের এই বিকৃতি ও ভণ্ডামির মূলে যে সমাজ ব্যবস্থার সক্রিয়তা ক্রিয়াশীল সে সম্বন্ধেও লেখক সচেতন। তাই যখন এই আদর্শবাদী, আত্মত্যাগে উজ্জ্বল নেতাকে সেসন ইনচার্জ ডসন অনুকম্পাবশত পুনরায় কাজে যোগ দিতে বলেছে, তখন তার মনে হয়েছে দারিদ্রপীড়িত সংসারের কথা, অসুস্থ স্ত্রী সুমিতার জ্বরতপ্ত মুখের কথা, ক্রন্দনরত খোকার কথা। সামান্য একটু ইতঃস্তত করার পর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ডসনের প্রস্তাবেই সম্মত হয়েছে সে। যে সামান্য বাধা মনে মনে অনুভব করেছে তা বিবেক দংশন নয় বরং তা 'চক্ষুলজ্জা'। এই চক্ষুলজ্জারও একটি আড়াল সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে— "ওদের মত লোকের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা ? বরং ওদের ব্যবহারের জবাব চাকরি নিয়ে ওদের ওপর সর্দারি ক'রেই দিতে হবে।" নিম্ন মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র মানুষের পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পণ এবং এর মধ্যেই মাথা উঁচু রাখার ভণ্ডামির বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এখানে। স্ত্রীর জন্য বেদানা আর খোকার জন্য লজেন্স নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন এই নেতা।

ভট্চাযের এই চাকরিতে পুনরায় যোগদানের খবর বিশ্বাস করতে পারেনি চাটুয্যের দল। তারা যা পারেনি, তাদের নেতা হয়ে ভটচায্ তা পেরেছে এই আশা ও বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই সেদিন বিকেলে দলবদ্ধভাবে ভটচাযের বাড়িতে গিয়ে তার চাকরিতে যোগদানের সংবাদ শ্রবণ করে তারা সেই সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি। বরং অবিশ্বাসের সুরে বলেছে— "যাঃ ঠাট্টা করছ! তুমি আবার তাই পার নাকি?" নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে এই শ্রমিকদের দল সচেতন, কিন্তু তাদেরই একজন সাহেবদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদের মনে যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিল সেই সান্ত্বনার স্থানটিও তাদের

ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। লাঞ্ছিত অপমানিত মানবাত্মার প্রতিবাদস্পৃহা সংহত বিদ্রোহ মূর্তি লাভ ক'রে যে অন্তরের পূজা লাভ করেছিল সেই আদর্শও ভেঙে পড়েছে। নিজেরা অধঃপতিত - দুর্বলচিত্ত হয়েও অন্যের বিল্পবের জ্যোতিতে আলোকিত হবার সুখ ও গৌরব লাভ করা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। তাই শ্রমিকদের নেতা তথা কথকের মনে হয়েছে— "ওরা কি সত্যিই আমার কাছে অন্য কিছু আশা করেছিল? সত্যিই দেখতে এসেছিল, ওরা যা পারেনি আমি তাই পেরেছি ? উইলসন আর ডসনের চেয়েও কি আমি ওদের বেশি নিরাশ আর বেশি আপমান করলুম ?"

গল্পের নির্মেদ ভারহীন দেহ একটি বক্তব্যকেই প্রকাশ করেছে, আর সেই বক্তব্য হল — মানবিক সম্পর্ক ও আচরণ স্বার্থচালিত, তা হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়। হৃদয়াবেগ ও মানুষের বিবেক কখনো কখনো প্রাধান্য লাভ ক'রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা পরিত্যাগ করতে না পারার জন্য তা শেষ পর্যন্ত ভন্ডামিতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের কথা স্মরণে আসে। 'নেতা' ও "গোত্রান্তর' উভয় গল্পেই লেখকদ্বয় আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। মধ্যবিত্তের আদর্শের নামে ভন্ডামি, আত্মপ্রতারণা, গর্ব,অসূয়া, আত্মাভিমান, ভীরুতা, নীচতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপসের সুবিধাবাদী প্রবণতা এই গল্পে পরিস্ফুট, একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের এই মেরুদন্ডহীন আচরণ ও সেই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা ও অন্যের মধ্যে এক আদর্শায়িত রূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষাও পরিস্ফুট। এই সব দুর্বলচিত্ত মানুষের হীনতা নীচতাকে উত্তরণ করবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও লেখক সমানভাবে সচেতন ও সহানুভূতিশীল।

এই প্রসঙ্গ আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পসমূহে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে 'কিশোর গল্প সমগ্র' -এ যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশতেই প্রধান চরিত্র বালক নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য চরিত্রেরাও অপরিচিত নয় বরং তাঁরই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ, খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্রেনাথ, বাড়ির কমবয়েসী ভৃত্য অনাথ প্রমুখ। এই চরিত্রগুলি যে নিছক সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করেছে তাই নয় এক্ষেত্রে সামান্য ছদ্মনামের আড়ালও লেখক রাখেননি। কিশোর গল্পের চরিত্র পল্টু, কান্দু ও বাঞ্ছু প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে নরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথেরই ডাকনাম। নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পগুলি যে কেবল তাঁর কৈশোর কালকে জীবন্ত ভাবে তুলে আনার জন্যই বিশিষ্ট তা নয়, এই গল্পগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট হল এখানে রাজা-রাণী-পক্ষিরাজ ঘোড়ার কাহিনি নেই, তথাকথিত ছোটদের গল্পের মত রাক্ষস-খোক্কস বা পরীদের কাহিনিও তিনি রচনা করেননি বরং নিজের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে, কিশোর বয়সের কল্পনাময় জগৎ, দুষ্টুমি, কলহ, বিবাদ, ভালোলাগা, অপূর্ণ সাধ, বন্ধুত্বের দাবী, মেলা দেখার অভিজ্ঞতা — এ সকলকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্পের উপাদান হিসেবে। তাঁর অন্যান্য গল্পগুলির মত তাঁর কিশোর গল্পও তাই

চেনাজগতের গল্প, পরিচিত জনের গল্প, মাটির কাছাকাছি গল্প।

নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্প 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে দেবসাহিত্য কুটির শারদীয়া সঙ্কলন 'অপরূপা' তে। এই গল্পে রয়েছে কিশোর মনের স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বিপজ্জনক এক দুর্ঘটনা। কাহিনির এই বিষয়টি ব্যতীত কিশোর মনের গভীর মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসনও রয়েছে গল্পটিতে, যা গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দান করে। নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে পূর্ববাংলার সদরদি গ্রমে। বর্ষাকালে তাদের বাড়ির চারধারেই জল থৈ থৈ করত, শুধুমাত্র বাড়ি গুলি "সমুদ্রের মধ্যে পিঠ ভাসিয়ে কোনরকমে জেগে থাকত"। যেহেতু বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই জল তাই কাজকর্ম, হাটবাজার, স্কুলে যাওয়া সব কাজেই নৌকা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। তাঁদের ঘাটেও দুটো নৌকো বাঁধা থাকত আর নরেন্দ্রনাথ তথা পল্টুর বাবা কাকারা যেমন তাতে করে কাজে যেতেন তেমনি পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুরা স্কুলে যেতেন সেই নৌকাতে চেপেই। সম্পন্ন ব্যক্তিদের নৌকো থাকলেও দরিদ্র চাষী বা মজুরেরা যাতায়াত করতে ব্যবহার করত তাল গাছের তৈরি ডোঙা, অথবা কলার ভেলা। যেহেতু পল্টুরা প্রতিদিন নৌকোতে চড়লেও ভেলা ও ডোঙাতে চড়তেন না তাই ভাবতেন — "... যত মজা ওই ভেলা আর ডোঙার মধ্যেই আছে। বড় বড় নৌকায় না গিয়ে, ওই যে ভেলা আর ডোঙায় কোন রকমে জলের ওপর একটু ভেসে থাকা ওতে ঢের বেশি সাহস আর বীরত্ব দরকার।" যেহেতু কিশোর বয়স তাই তাদের মনে বীরত্ব দেখাবার সাধটিও প্রবল হয়ে উঠেছে, আর বীরত্ব দেখাবার উপাদানটি হল কলার ভেলা। কলার ভেলা শুধু পল্টু বা কান্দুদের বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যমই নয়, এই ভেলা ছিল তাদের আকাশচারী কল্পনারও বাহন। তাই স্কুলের পণ্ডিতমশাই যখন মহাদেশ, মহাসাগরের নাম মুখস্থ করান বা মানচিত্র নীল রঙের সমুদ্রগুলিকে চিনিয়ে দেন তখন বালক পল্টুর মন ভেলা নিয়ে সেই নীল রঙের সমুদ্রে ভেসে পড়ত, সমুদ্র পাড়ি দেবার সংকল্প জাগত তাঁর মনে — "ক্লাসে বসে ব্লাকবোর্ডের ওপর টাঙানো বড় মানচিত্রটায় মহাসমুদ্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে আমার মন সেই খালের ঘাটে ভেলার কাছে চলে যেত। আবার কোনদিন বা ওই ভেলাটাকে নিয়েই মহাসমুদ্রে ভেসে পড়ত। মানুষের কত দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনতাম পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। প্রথমেই তো মানুষ আর লঞ্চ স্টীমার তৈরি করতে শেখেনি। সুমুদ্রপাড়ি দেওয়ার জন্যে পাল তোলা কাঠের নৌকো গাছের গুঁড়িই তো ছিল সম্বল। তারা যখন পেরেছে আমরাই কি পারব না ? মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার চূড়ায় চূড়ায় ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে পাতালের মণিমুক্তা লুঠতে লুঠতে আমরাও কি এক অজানা রাজ্যে গিয়ে পৌছাতে পারব না ?" কলার ভেলাকে নিয়ে কিশোর মনের এই কল্পনাই পল্টু, কান্দু ও বাঞ্ছুকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভেলা বানাতে। বাড়ির ভৃত্য অনাথের শরণাপন্ন হয়েছে তারা, কিন্তু অনাথ তাদের ভেলা তৈরি করে দেয়নি বরং তাদের 'গোপন আবদার' প্রকাশ করে দিয়েছে বাড়ির বড়দের কাছে। ছোটদের ভেলা বানাবার পরিকল্পনায় বড়রা কেউ করল হাসাহাসি, কেউ করল

ঠাট্টা আবার কেউ করলেন শাসন। বাবার বকাঝকার সঙ্গে জুটলো বীরেনদারও তর্জন। এই বীরেন চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখক প্রকাশ করেছেন কিশোর বালকের মনস্তত্ত্বকে। বীরেন পল্টুর আপন দাদা নয়, শুধুমাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য তাদের বাড়িতে এসে রয়েছে, বছর চোদ্দোর স্বাস্থ্যবান বীরেন পড়াশুনায় ভালো ও ভালো ছেলে বলে সবার সমাদার লাভ করে। পল্টু থেকে তিন ক্লাশ উপরে পড়া বীরেনদার সমান মর্যদা পল্টু পায় না বরং মাছের বড় মুড়ো বা দুধের সরও বীরেনদাই বেশি মাত্রায় পায় বলে পল্টু বীরেনদাকে হিংসে করে। শুধু তাই নয় বীরেনের ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখাও পল্টুর হিংসের কারণ, এই সব কারণে — "বীরেনদার জন্যে আমার (পল্টুর) বুকের মধ্যে হিংসার এক বিশাল অতলান্ত সমুদ্র লুকিয়ে ছিল।" গম্ভীর স্বভাবের বীরেনদাকে পল্টু দেখতে পারেনা, অন্যের মুখে তার নিন্দে শুনলে পল্টু খুশি হয়। এইভাবে বীরেনের প্রতি পল্টুর মনোভাব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কিশোর বয়সী বালকের বিশিষ্ট মানসিকতাটি পরিস্ফুট। যাইহোক অনাথ ভেলা বেঁধে না দেওয়ায় পল্টুরা শরণাপন্ন হয়েছে প্রতিবেশি গোপাল ঘরামির মেয়ে বালবিধবা বুঁচী পিসির। পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়ায় একদিন সত্যি সত্যিই বুঁচী পিসি তৈরি করে দিয়েছে এক কলার ভেলা। সেই কলার ভেলা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে পল্টুরা। তাদের কাছে কলার ভেলা প্রতিভাত হয়েছে সোনার ভেলা রূপে। বড়রা সকলে খুশি না হলেও ভেলাটাই কদিন হয়ে উঠল ছোটোদের খেলার প্রধান উপকরণ। শুধু ভেলাতে চড়ে জলে ভেসে বেড়ানোই নয়, তারা চেষ্টা করল ভেলাটিকে সুসজ্জিত করতে, চেষ্টা চলল ছই ও পাল খাটানোর। ভেলা নিয়ে এই আনন্দের উৎসব বেশিদিন স্থায়ী হোলনা বরং একদিন স্কুলে যাবার সময় নৌকা না পেয়ে বড়দের কথা অগ্রাহ্য করে বাঞ্ছু একাই ভেলা নিয়ে স্কুলে যাবার চেষ্টা করেছে আর তার ফল হয়েছে মারাত্মক। একাকী লগি ঠেলতে গিয়ে গাব গাছে লগির ধাক্কা লাগায় বাঞ্ছু জলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারে ভীড় হয়ে গেছে, চেঁচামেচি শুরু হয়েছে কিন্তু বাঞ্ছুকে উদ্ধার করতে কেউ জলে নামতে সাহস পায়নি। এমন সময় বাঞ্ছুর পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পল্টুর হিংসার পাত্র বীরেনদা। গায়ের জামা খুলে, পরনের কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে জলে আর তারপর নিপুণ দক্ষতায় সাঁতরে গিয়ে বাঞ্ছুকে তুলে এনেছে জলের নীচ থেকে। সংজ্ঞাহীন বাঞ্ছুকে বাচাঁতে সে এরপর ডাক্তারকেও ডেকে এনেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারই চেষ্টায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বাঞ্ছু। রাতারাতি বীরেনের জয়গৌরব গেয়ে উঠেছে সবাই, পল্টুও হিংসা পরিত্যাগ করে বীরেনকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে আর সাধের ভেলাটা সহসা তার দৃষ্টিতে হয়ে পড়েছে অপয়া। বিকেল বেলা চুপি চুপি ভেলাটার খোঁজ নিতে গিয়ে পল্টু দেখে সেটিকে কেউ ভাসিয়ে দিয়েছে, ভাসতে ভাসতে সেটা চলে গেছে নদীর দিকে। এই ভাবে পল্টুর 'ময়ূরপঙ্খী'-এর করুণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কলার ভেলা তাদের স্বপ্নকে মুক্তি দিয়েছে, তার স্মৃতিকে লেখকের মনে অক্ষয় করেছে- "সেই ভেলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছে। এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে গিয়ে

পড়েছে। তার আর ফিরে আসবার গরজ নেই। কেনই বা থাকবে। নীল সমুদ্রের ফেনা গায়ে মেখে গভীর সুনীল সমুদ্রে সে শুধু ভাসবে আর ভাসবে।"

এইভাবে দেখা যায় একটি সামান্য কলার ভেলাকে কেন্দ্র করে লেখক বাল্যমনের কল্পনা, সাধ ও স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছেন আবার একই সঙ্গে শিশু মনের মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসনেও গল্পটি উজ্জ্বল।

নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় খুব সহজ সরলতার সঙ্গে কাহিনি বিবৃত হলেও সেখানে গভীরতার ছোঁয়া বর্তমান। এমনই এক গল্প 'অনাথের কীর্ত্তিকলাপ'। নরেন্দ্রনাথ তথা পল্টুদের বাড়ির ভৃত্য অনাথকে নিয়ে রচিত এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে, দেব সাহিত্যে কুটির শারদীয় সঙ্কলন 'অপরূপা'য়। শিশুকাল থেকে অনাথের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য অনুভব করলেও সে যে বাড়ির ভৃত্য তা উপলব্ধি করতে পারেনি পল্টু। সে দেখেছে তাকে ও তাঁর ভাইদের বই শ্লেট নিয়ে স্কুলে যেতে হয়, সন্ধ্যার পর গল্প শোনা ছেড়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে হয়, অঙ্ক কষতে হয়, ইংরেজি পড়তে হয়, পড়তে পড়তে ঝিমুনি এলে বা গল্প করলে মাস্টারমশাইয়ের ধমক বা কানমলা খেতে হয় অথচ অনাথকে এসব কোনো 'বাজে কাজ' করতে হয়না বরং তার বদলে অনেক মজার মজার কাজ করবার ভার সে পেয়েছে। যেমন অনাথ অনায়াসে বাবা কাকাদের পিছনে পিছনে থলে নিয়ে ভাঙ্গার বাজারে যায় নিয়মিত, যেখানে পল্টুরা কদাচিৎ যাবার সুযোগ পায়। এছাড়া বর্ষাকালে যখন বাড়ির চারপাশে জল হয়ে যায়, নৌকা করে যাতায়াত করতে হয় তখন পল্টুদের নৌকার চালক হয় এই অনাথ। নিজেদের সকল বাধ্যতামূলক কাজই তাই কিশোর পল্টুদের কাছে 'বাজে কাজ' আর অনাথের সব কাজই তাদের কাছে আকর্ষণীয়, হিংসার যোগ্য। তাই তারা অনাথের মত হতে চায়, তাদের মতে — "অনাথের মত হতে কে না চায় ?" আর "অনাথের মত সুখী কে ?"। অনাথও পল্টুদের মনের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে, তাই পান্তাভাত খাবার জন্য লালায়িত পল্টুদের দেখিয়ে দেখিয়ে সে রোজ পান্তাভাত খায়, আর তাই দেখে পল্টুরা লালায়িত হয় — "পোড়া লঙ্কা কি কাঁচা লঙ্কা পাতে ঘষে ডাল পোড়া দিয়ে মেখে দিব্যি হুস হুস করে অনাথ ভাতের থালা শেষ করে। খাওয়া হয়ে গেলে থালার জলটুকু — যাতে এখন অপূর্ব ঝোলের স্বাদ — চুমুকে চুমুকে শুষে নেয়। সেই এক ঘেয়ে গরম ভাত খেতে গিয়ে হিংসায় আমাদের বুক জ্বলে, চোখ টাটায়, জিভ দিয়ে জল পড়ে। গরমের দিনে পান্তা ভাত শীতের দিনে পরশুতি, অনাথের মত সুখী কে?"

অনাথের প্রতি হিংসায় পল্টুরা অনাথকে জব্দ করতে ফন্দি আঁটে, তাকে অপমান করে গায়ের জ্বালা মেটাতে চায় কিন্তু বয়সে ও শক্তিতে বড় অনাথের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না, উল্টে অনাথের প্রতি সহানুভূতিশীল বাবার কাছে তাদের শাস্তি পেতে হয়। এই ভাবে দিন যায়, পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুদের বয়স বাড়ে, কেউ হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, কেউ প্রাইমারি স্কুলে ছেড়ে এম.ই.স্কুলে আসে, নতুন নতুন বই, নতুন

নতুন বন্ধু, জগতকে নতুন চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় তাদের, কিন্তু অনাথ থেকে যায় সেই তিমিরেই। যে কারণে শিশু বয়সে অনাথকে তারা হিংসা করত তা যে তাদের অপরিণত বুদ্ধিরই ফল সেবিষয়টি পল্টুরা অনুধাবন করতে শেখে আস্তে আস্তে। লেখক বলেন — "কিন্তু অনাথের সেই একই কাজ বাঁধা। হাট করে বাজার করে গরু রাখে বর্ষার দিনে নৌকা বায়, কুয়োর দড়ি ছিঁড়ে গেলে দিদিভাইয়ের সঙ্গে বসে বসে দড়ি পাকায়। যখন পাট কাটার সময় হয় চাষীদের সঙ্গে যায়, নিজের হাতে পাট না কাটলেও পাট ধোয়ার সময় থাকে, মেলার সময় থাকে। ধান কাটার সময়ও চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় ওকে। আমার অনেক পড়া আর ওর অনেক কাজ।"

ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে অনাথের চালচলন বদলে যেতে থাকে, বাড়ির মা কাকীমাদের কথা সে ভাল করে শোনে না, মুখে মুখে তর্ক করে, কাজে ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দেয়, তাস খেলে, কখনও বা লুকিয়ে বিড়ি বা সস্তা সিগারেট খায়। বহু বেয়াড়াপণার পরেও সে কাজে বহাল থাকে, কিন্তু একদিন তার বাড়ি ছাড়বার দিন আসে, সে নিজেই পল্টুর বাবার কাছে তাকে বিদায় দেবার আর্জি জানায়। গ্রামে টিউবওয়েল বসাবার লোকদের সঙ্গে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চায়, বাড়ির ভৃত্য হয়ে সে থাকতে চায় না বরং বৃহত্তর পৃথিবীর ডাকে সাড়া দিতে চায়, নিজের জীবনকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চায়। যে পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুরা একদিন অনাথকে হিংসে করত, জব্দ করতে চাইত, তারাই অনাথকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, বিদায়ের অশ্রুজলে অনাথের বিদায়যাত্রা করুণ হয়ে উঠে। পল্টুর পিতা বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ মহেন্দ্রনাথও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন, কাছারি কামাই করে সেদিন তিনি বাড়িতেই ছিলেন এবং খাঁচার দরজা খুলে নাম না জানা বুনো পাখিটিকে নিজের হাতে ছেড়ে দেন। এই ভাবে দেখা যায় সরল সহজ হাল্কা চালের কিশোর গল্পও ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে।

বাল্যের খেলার সঙ্গী কুশল সাহাকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'কুশল' গল্পটি। গল্পটি কুশলের বোকামি নিয়ে। বুদ্ধি কম বলে গ্রামের সকলেই কুশলকে ডাকে 'বোকা কুশা' বা 'কুশা বোকা'। ভারী শান্ত ও নিরীহ বলে কুশলের প্রতি পল্টুর সহানুভূতি আছে, মমত্ব আছে, কিন্তু অন্তরের সেই বেদনাকে সে প্রকাশ করতে ভয় পায়, বোকা কুশল তার বন্ধু একথা সবাই জানলে যদি অন্য সকলে তাকেও বোকা মনে করে তাই পল্টু কুশলের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে মেশে। তাই পল্টু অন্যের সামনে কুশলকে বন্ধু বলে ঘোষণা করতো না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের এই দৃঢ়তার অভাব ও সাহসহীনতাকে অকুণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ গল্পে প্রকাশও করেছেন — "কিন্তু ও (কুশল) যে আমার বন্ধু একথা সবাইর সামনে ঘোষণা করতে আমার সাহস ছিল না। পাছে কানাইরা আমাকেও ওরই মত একজন কেউ বলে ভেবে বসে। তাহলে ঠাট্টা - তামাশায় আমাকে অস্থির করে তুলবে। তাই কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি ওকে ভালোবাসতাম না। বরং ওর সঙ্গে যে আমার তেমন ভাব নেই, কানাই আর লিচুদা বেচুদার সামনে সেইরকম ভাবই দেখাতাম।

আমি ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসতাম। আমি ওকে ভয়ে ভয়ে ভালোবাসতাম।" অন্যের দ্বারা উপহাসের পাত্র হবার ভয়ে পল্টু তাই অন্যদের সঙ্গেই বেশি মিশতো আর ওদের সঙ্গে মিশে কুশলের অফুরন্ত বোকামির গল্প শুনতো। নিজে সে বোকা এই বোধটি কুশলের ছিল, আর তাই চালাক হবার লোভে সে গাঁয়ের নাপিত প্রাণনাথ শীলের পরামর্শ মতো তেঁতুলের বিচি গুড়ো করে খেয়ে ডায়রিয়ায় ভুগেছে, রসগোল্লার রস বলে লোকে তাকে গোবুর গামলার বৃষ্টির জল খাইয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কুশলের পরিবর্তন হয়েছে, বোকার মতো কাজ ও কথাবার্তাও সে আর তেমন বলে না, কিন্তু বোকা নাম তার ঘোচেনি বরং লোকের চোখের চাউনি, হাসি ও তার সঙ্গে ব্যবহার থেকেই কুশল উপলব্ধি করে যে বোকা উপাধি তার ঘোচেনি। কুশলের বাবাও কুশলের বদলে তার ছোটো ভাইকেই নিজের ব্যবসার কাজ সঁপে দিয়েছেন। কুশল অভিমানী হয়েছে কিন্তু তবুও সহ্য করে নিয়েছে। কুশলের কিছু গুণাবলীও ছিল যে সব কাজে তেমন বুদ্ধি খাটাবার দরকার নেই, সে সকল কাজ কুশল খুব ভালই পাড়ত যেমন —" কারো অসুখবিসুখ হয়েছে — ডাক্তার ডাকতে হবে পাঠাও কুশলকে। পাঁচ সাত মাইল দূরে কাউকে জরুরী একটা খবর দিয়ে আসতে হবে, কুশল এক পায়ে খাড়া। পাড়ার কোন বাড়িতে পুরুষ ছেলে কেউ নেই, পাহারা দিতে হবে, কুশল কুকুরের মত সেখানে জেগে বসে থাকবে।" কিন্তু এইসব গুণ থাকা সত্ত্বেও নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য সে তার কোনো মূল্য পায়নি, তাই হঠাৎ একদিন সে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এইখানে এসে গল্পটি যেন একটু কারুণ্যের স্পর্শ পেয়েছে। এরপর বছর খানেক পরে হঠাৎ লেখক শহরে যাত্রা দেখতে গিয়ে কুশলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যাত্রায় এখন কুশল অভিনয় করে আর অভিনয়ে তার সাফল্যের কারণও তার বুদ্ধিহীন প্রকৃতি। সে বোকার পার্টেই অভিনয় করে। বাল্যের সঙ্গীর কাছে তাই গল্পের শেষাংশে কুশল স্বীকার করে এই সত্যটিকে — "পেটের দায়ে এই চালাকিটুকু শিখেছি। আমি যতখানি বোকা তার চেয়েও বেশী বোকার পার্ট করতে পারি, আমি যতখানি ভালোমানুষ তার চেয়েও বেশী ভালোমানুষ সাজতে পারি আজকাল।" —এই ভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ কিশোরগল্পের মধ্যেও গভীরতা আনয়ন করেন, চরিত্র বিশ্লেষণ ও শিশু কিশোরদের মনস্তত্ত্বের দিকটিও গল্পে অসাধারণ দক্ষতায় পরিস্ফুট হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পের অধিকাংশই তার বাল্য জীবনের কাহিনি, অনেকক্ষেত্রেই তাদের পারিবারিক ঘটনার বিবরণ, আর এই সকল গল্পে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা ও মাত্রাগত বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। যেমন জেঠিমার মুখে শোনা কাল্পনিক গল্প রয়েছে 'কুমির' গল্পে, ছেলেবেলার অপূর্ণ সাধের গল্প ('ঘড়ি'), শীতকালে গ্রামে আয়োজিত ঘোড়দৌড়ের কাহিনি ('কানা বসিরের ঘোড়া') গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও মন্ত্রতন্ত্রের কথা('বাটি চালান'), নষ্টচন্দ্রের দিন গ্রাম বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার কথা ('নষ্টচন্দ্র'), প্রথম রথের মেলা যাবার অভিজ্ঞতা, ('মোহনবাঁশি'), প্রথম বাড়ি

ছেড়ে একাকী বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা ('প্রথম প্রবাস') প্রভৃতি বিষয়কে নরেন্দ্রনাথ রূপদান করেছেন তাঁর কিশোর গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলি যেমন তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে তেমনি সাধারণ গল্পগুণও এদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা ঃ

উপনিষদে বলা হয়েছে 'জাতস্য হিধ্রুবো মৃত্যু'। আবার "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে" — এ কথাও চিরন্তন সত্য। কিন্তু মানুষের জীবনে নিজের মৃত্যুর কোনো স্থান থাকবার কথা নয়, কারণ মৃত্যু জীবনের পরের ঘটনা। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ মৃত্যুর সেখানে কোনো প্রবেশাধিকার নেই। জীবন চলে গেলেই ঘটে মৃত্যু, ফলে "আমি মরে গেছি" এই বোধ মানুষের জীবনে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসম্ভব। কিন্তু মৃত্যু ও মৃত্যুচেতনা ঠিক এক জিনিস নয়, জীবৎকালেই মানুষের অন্তরে এই বোধের জাগরণ ঘটতে পারে। কেবল ঘটতে পারে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। নিজের পরিচিতজনের মৃত্যু, অপরিচিতজনের মৃত্যু, আত্মীয়-পরমাত্মীয়ের মৃত্যু, নিছক অনাত্মীয়ের মৃত্যু, স্বাভাবিক মৃত্যু, রোগভোগের পর মৃত্যু, - অপঘাতের অপমৃত্যু — এই সব বিভিন্ন জনের ও বিভিন্ন ধরনের জীবনাবসানের বিষয় আমাদের মনোলোকে প্রভাব ফেলে এবং এর দ্বারা আমরা মৃত্যুর সঙ্গে যেমন পরিচিত হই তেমনি আমাদের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে চেতনারও জন্ম হয়। তবে এই চেতনা সকলের কাছে সমান নয়, এমনকি একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্বে এই মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি বা চেতনার সঞ্চার পৃথক পৃথক ভাবে হতে পারে। আমাদের জীবনের সৃষ্টি রহস্য যেমন জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ তেমনি জীবনাবসানের পরের রহস্যও জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ এবং গভীরতর উপলব্ধিতে জীবন-জিজ্ঞাসা ও মৃত্যুচেতনা একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ বলে বোধ হতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন কাল যাপনের সঙ্গেও মৃত্যুর একটি সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের একটি দিন অতিবাহিত হওয়ার অর্থ মৃত্যুর দিকে একটি দিন এগিয়ে যাওয়া। এই বোধ মানুষকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে না কিংবা জীবনযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে এই মৃত্যুর বোধ মানুষকে আচ্ছন্ন করতে পারে। তাছাড়া প্রগাঢ় অনুভূতিশীল মানুষ এই চেতনা বা উপলব্ধিকে অন্তরে লালন করতেই পারেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই মৃত্যু-চেতনা মানুষের মানসিকতা ভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি জীবনের বিভিন্ন পর্বে বা স্তরে এই উপলব্ধি জাত প্রতীতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যকেরা প্রগাঢ় অনুভূতিশীল মানুষ তাই তাদের চেতনায় এই মৃত্যু ভিন্নতর উপলব্ধির মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই চেতনাও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মৃত্যু' কবিতায় বলেছেন —

" মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।"

অচেনা অজানা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে তিনি ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু কবিতার শেষে দেখা যায় সেই ভয় ভেঙে গিয়ে এক সুস্পষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হয়ে তিনি বলেন -

" ..... জীবন আমার।
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।"

এই মৃত্যুকে তিনি মুক্তি হিসাবেও দেখেছেন। এই মুক্তি একই জন্মের মধ্যে আবদ্ধ একরূপতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। 'উৎসর্গ' কাব্যের 'জন্ম ও মরণ' কবিতায় তাই তিনি লেখেন —

" কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে,
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

আবার এই মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন প্রিয়তম রূপে, সাধনার ধন রূপে। রাধার সাধনার ধন শ্যাম রূপে তিনি আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন মৃত্যুকে। কখনও বলেছেন 'মৃত্যু-অমৃত', কখনও বলেছেন "তামবিমোচন"। তার ভাষায় —

"মরন রে।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। ...
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।" ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')

কখনও তিনি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন মৃত্যুকে — "মরণ তু আওরে আও"

('মরণ' ঃ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনায়, বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্বের কবিতাতেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ভাবনাটি প্রকাশিত।

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও বিশিষ্ট মৃত্যু চেতনার প্রকাশ আছে, যেখানে তিনি মৃত্যুর কাল — মৃত্যুর পটভূমিকে বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় প্রকাশ করেছেন। কখনও জন্মান্তরের মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এতো গেল কবিদের কথা,

কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও মৃত্যুচেতনার প্রকারভেদ দেখা যায়। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের প্রধান অবলম্বনই মানুষের মৃত্যু জিজ্ঞাসা। এই উপন্যাস এর — "অন্তঃস্থ জীবনধারা মৃত্যুর পটভূমিতে অবস্থিত এবং মৃত্যুর নিরিখেই জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষিত, মৃত্যুর কাছে জীবন গৌণ কিনা — প্রশ্ন পরে বিবেচ্য।"[২৪] তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে ('আরোগ্য নিকেতন') মৃত্যুর পৌরাণিক পরিচয়ও দিয়েছেন। যেখানে ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে মৃত্যুর দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর পৌরাণিক পরিচয়ের মূল উৎসটি তারাশঙ্কর যে ভাবে অনুসন্ধান করেছেন গৌরমোহন রায় তাঁর 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা' গ্রন্থে তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা থেকে ঔপন্যাসিকের মৃত্যু সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিটিও পরিস্কার হয়। এখানে তিনি বলেন —

" ১) জীবের বাসভূমি বিশ্বকে আবিলতামুক্ত করায় প্রয়োজনেই মৃত্যুর সৃষ্টি।

২) মৃত্যু অনিবার্য সত্য।

৩) মৃত্যু পক্ষপাতহীন ও নির্মম ও আপন নিষ্ঠুরতায় কাতর .....

৪) মৃত্যুর সহযোগী শক্তি যমরাজ ও ব্যাধিসমূহ এবং এভাবেই মৃত্যুর কাঠিন্য সরলীকৃত।

৫) আবার ব্যাধির মূলীভূত কারণ লোভ, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি।

৬) এগুলির অন্তরালে আছে মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনের মধ্যেই মৃত্যুর অধিষ্ঠান।"[২৫] এই ভাবে একটি উপন্যাসের বর্ণনা অংশের বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের বিশিষ্ট মৃত্যুচেতনার রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এইভাবে দেখা যায় প্রগাঢ় অনুভূতিপ্রবণ সাহিত্যকদের বিশিষ্ট মানসিকতা — মৃত্যু সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি তাদের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। কখনও মৃত্যুর পাদস্পর্শে মর্মভেদী আর্তনাদ জেগে ওঠে, কখনও ব্যাধি ও জরার অবসানে মৃত্যু শান্তি আনয়ন করে, কখনও মৃত্যু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোন দার্শনিক উপলব্ধিতে আবার কখনও কোনো সম্ভাবনার অপমৃত্যুতে নৈরাশ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। আবার কখনও মানুষের জীবনের মধ্যেই ছায়াপাত ঘটায় মৃত্যু, মানুষ হয়ে পরে জীবন্মৃত। এই বিভিন্ন রূপভেদকেই গল্পকারেরা প্রত্যক্ষ করেন, অন্তরে অনুভব করেন এবং নিজস্ব চেতনার বিশিষ্টতা তাঁরা সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এখন নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা প্রকাশক ছোটগল্পগুলিকে আলোচনা করে তাঁর বিশিষ্ট মৃত্যুচেতনার দিকটিকে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রারম্ভেই একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, যা তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের। কিন্তু এই মৃত্যু তাঁকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না বরং বলা যায় এই মৃত্যু তাঁকে মোটেই প্রভাবিত করেনি, কারণ তাঁর নিজের মায়ের মৃত্যুর খবর তিনি বড় হয়ে শুনেছিলেন, যেহেতু মায়ের মৃত্যুকালে তিনি নিজে ছিলেন খুবই ছোট। তাঁর পিতার দুটি বিবাহ এবং তাঁর বড় স্ত্রী জগৎমোহিনীকেই

নরেন্দ্রনাথ মা বলে জানতেন। নিজের জন্মদাত্রী মা বিরাজবালার স্মৃতি তাঁর জীবনে খুব বেশি ছিল না। জীবনে সবচেয়ে নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুশোকের বেদনা তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করেছেন জ্যাঠতুতো দাদা বিরূপাক্ষের কন্যা লক্ষ্মীর মৃত্যুতে। ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তিনি প্রবলভাবে শোকগ্রস্ত হন। ৩১শে জুলাই, ১৯৪০ সালে লিখিত একটি চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। ৬৬,শোভাবাজার লেনে থাকবার সময় স্ত্রী শোভনাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন — "লক্ষ্মীর মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। এত নিকট আত্মীয় ও স্নেহের পাত্র জীবনে এই প্রথম হারালাম। ছেলেবেলা থেকেই ওকে খুব ভালোবাসতাম। যতদিন বাড়িতে ছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছি। ও অনেকদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করবে, কৈশোরে এ কল্পনা আমাকে খুব আনন্দ দিত। ও খুব বুদ্ধিমতী ছিল তেমন শিক্ষা ও সাহচর্য পেলে সে বুদ্ধি খুব মার্জিতও হতে পারত।"[২৬] ভাইঝির এই মৃত্যুকে নরেন্দ্রনাথ এক সম্ভাবনার অকালমৃত্যু হিসাবে দেখেছেন এবং দুঃসহ বেদনা লাভ করেছেন। এই বেদনার প্রকাশ রয়েছে চিঠির পরবর্তী অংশে, যেখানে তিনি লেখেন — "ওর মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ও-বাড়িতে। প্রথমটা অনুভূতি যেন কেমন অসাড় হয়ে গেল। মনে হল, বিষয়টা আমি নির্লিপ্ত, স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছি। শোক যেন আমাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। বৌদিকে গতানুগতিক অনেক সান্ত্বনার কথা বললাম বহুক্ষণ ধরে। তারপর যতবার মনে হতে লাগল, ও নেই, ততবার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠতে লাগল। সে-দুঃসহ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অথচ অনেকদিন পর্যন্ত ওর কথা তো প্রায় ভুলেই ছিলাম। শেষের দিকে বছরে ক'বারই বা ওর কথা মনে পড়ত, আর ক'বারই বা ওর সঙ্গে দেখা হত। জীবিত অবস্থাতেই ও তো আমার অনুভূতির বাইরেই প্রায় চলে গিয়েছিল। এখন সে-কথা যখনই মনে হয়, তখনই দুঃসহ বেদনায় হৃদয় আছন্ন হয়ে যায়।"[২৭] এই চিঠির বক্তব্যেই পরিষ্কার শৈশবকালের জন্যই হোক আর জগৎমোহিনীর স্নেহের কারণেই হোক নিজের জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যুশোক বা বেদনা নরেন্দ্রনাথের অন্তরে জাগরুক ছিল না। জীবনে প্রথম মৃত্যুশোক তিনি অনুভব করেন ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারেননি বরং কিছুটা অসাড় নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই অন্তরঙ্গ নয় বরং 'গতানুগতিক' শোক সান্ত্বনা জানিয়েছেন বৌদি কুসুমকুমারীকে। কিন্তু পরে শান্ত-ভারসাম্য অবস্থায় এই শোককে প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করেছেন, সন্তপ্তকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছেন, সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন প্রাত্যহিকতার চাপে, জীবনকালে যাকে ভুলেই বসতে চলেছিলেন তারই মৃত্যু এই ভুলে থাকার ভ্রমকে ভেঙ্গে দিয়েছে। শোকের সান্ত্বনায় তিনি গতানুগতিক বাণী উচ্চারণ করেছেন — এসবই বহিরঙ্গ ব্যপার। প্রকৃতপক্ষে এই মৃত্যু আঘাত করেছিল তাঁর অন্তরে, তাই জীবিত অবস্থায় যাকে ভুলে থাকতে পেরেছিলেন, তাকে মৃত্যুর পর ভুলতে পারছেন না। মৃত্যুর ভয়াবহ শূন্যতা গ্রাস করেছে লেখকের অন্তরকে।

মৃত্যুর ঘটনা ও তার অভিঘাত এবং এর পরবর্তীকালের সামাজিক কর্তব্য পালন — সবমিলিয়ে এক সামগ্রিক অনুভূতি, এসবই প্রকাশ পেয়েছে নরেন্দ্রনাথের 'বীতশোক' গল্পে। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৮শে আষাঢ়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায়। বীত শব্দের অর্থ অতীত, বিগত বা অপগত। আর বীতশোক শব্দের অর্থ শোকমুক্ত। এই গল্পে কলেজের শিক্ষক অনিমেষ গিয়েছেন তাঁর বাল্যবন্ধু শীতাংশুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শৈলেশ্বর ও সদ্যবিধবা স্ত্রী সুনন্দাকে সান্ত্বনা দিতে। মৃত্যুর পর দুমাস কেটে যাবার কারণেই হোক বা বার্দ্ধক্যজনিত কারণে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপলব্ধির ফলেই হোক অথবা গীতা উপনিষদের সর্বসন্তাপ দূরকারী বাণী সমূহের প্রভাবেই হোক, বৃদ্ধ শৈলেশ্বর পুত্রের মৃত্যুতে সংযত শোকবেদনা প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে শীতাংশুর স্ত্রী সুনন্দার মধ্যেও শোকের তীব্রতা বা প্রাবল্য দেখতে পাননি অনিমেষ। বরং অসুস্থ শীতাংশুর মৃত্যুকে শীতাংশুর রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ বলেই স্ত্রী সুনন্দা মনে করেছেন। সুনন্দা বলেছেন — "দু মাসও নয়, আরও অনেক আগে থেকেই বলতে গেলে তিনি ছিলেন না। যে ভাবে ছিলেন তাকে থাকা বলে না। তিনি বেঁচে গেছেন।" পিতা শৈলেশ্বরও আরও দুজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদের সঙ্গে একযোগে নিজের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেছেন।এই মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সময় তাঁর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠে নি, গলার স্বরও কেঁপে ওঠে নি — "মাস দেড়েক আগে আমার একটি ভাই মারা গেছে। সে অবশ্য আলাদা বাড়িতে থাকত।তবু তো ভাই। তারপর সে দিন গেলেন আমার একজন বন্ধু,অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারও আগে গেছে ছেলে। শীতু তো তোমার বন্ধু ছিল অনিমেষ। সে আর নেই।" মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার এই অশ্রুহীন নিরাসক্ত স্বপ্নভাষা অনিমেষকে অবাক করেছে। তিনি এসেছিলেন শোক সন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিতে, স্বামীহারা স্ত্রীকে সদ্য বৈধব্যের যন্ত্রণায় উপশমের মলম লাগাতে , কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। চিরদিন কোনো স্মৃতিকেই মানুষ বহন করতে পারে না, চরম শোককেও পারে না। যতই সেই শোক কোনো একটি মুহূর্তে হৃদয়বিদারক বলে মনে হোক না কেন। বাড়ি ফিরবার সময় অনিমেষের মনে হয়েছে তিনি শোকে সান্ত্বনা জানাতে এসেছিলেন বটে কিন্তু তার প্রকাশ তো সেখানে দেখা যায় নি। কারণ — "শোকেরও তো একটা অনুষঙ্গ চাই।" তাই অনিমেষ দেখেছেন পুত্রহারা পিতা রোগী দেখায় ব্যস্ত থাকছেন,স্বামী হারা সদ্য বিধবা স্ত্রী অম্লান বদনে অতিথি সৎকার করেছেন — হাস্যমুখে সাধারণভাবে কথা বলেছেন — পতির মৃত্যু শোকে নিস্পৃহতা দেখিয়েছেন। এরজন্য একদিকে অনিমেষের হয়তো সুবিধেই হয়েছে, কারণ — "শোকে তিনি সান্ত্বনা দিতে অক্ষম। শোকের পরিবেশে নিজেকে কেমন যেন বিমূঢ় মনে হয় অনিমেষের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় । এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিক কথাই তো লোকে বলে। কিন্তু সেই বাঁধাঁ ধরা কথাগুলিও অনিমেষের মুখ থেকে বেরোতে চায় না। নিজেরই কেমন যে অস্বস্তি লাগে। তাই তিনি যথাসম্ভব এই সব অনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে চলেন।" এখানে অনিমেষকে শোকের আনুষ্ঠানিকতা

থেকে নিজেকে জোর করে সরাতে হয় নি বরং তাঁর থেকেই শোক প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা দূরে সরে গেছে।কোনো গতানুগতিক সান্ত্বনার বাণীও তাকে উচ্চারণ করতে হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নরেন্দ্রনাথও ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে গতানুগতিক সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু শোক অনুভব করেছিলেন অন্তরে। তেমনি অনিমেষও শীতাংশুর শোককে নিভৃত অন্তরে অনুভব করতে চেয়েছেন।প্রবল শোকাবেগের উদয় হয়েছে কিন্তু অচিরেই তা সয়ে গেছে। শোকের অভাবে নিজের অনুভূতিশূন্য মনের পরিচয় পেয়েছেন অনিমেষ, নিজেকে তাঁর অংশত মৃত বলে মনে হয়েছে। অদর্শন জনিত দূরত্বের কারণে, আধুনিক নগর সভ্যতার ইঁদুর দৌড়ের কারণে আমাদের মনে হয়তো স্মৃতি থাকে, কিন্তু স্মৃতিমেদুরতা থাকে না; সম্পর্ক থাকে, কিন্তু সম্পর্কের উষ্ণতা থাকে না।এই হৃদয়হীনতা, উপলব্ধি -অনুভূতিহীনতায় অনিমেষ কষ্ট পেয়েছেন। শীতাংশুর জন্য তার আপসোস হয়েছে কিন্তু তিনি শোকার্ত হননি। অনুতপ্ত অনিমেষ তাই নিজের অন্তরে চেয়েছেন — "একটি নীরব নিভৃত শোকসভার আয়োজন হোক।" কিন্তু এই নিভৃত শোকসভার জন্য যে আবেগের প্রয়োজন, সেই আবেগ সঞ্চারও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেই ক্ষণিকের আবেগও তার পক্ষে সহজলভ্য হয়নি। শেষ বিচারে অনিমেষের মনে হয়েছে কেবল দৈহিক মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু নয়,মন, মানসিকতা ও স্মৃতির মৃত্যুও মৃত্যু, যে মৃত্যুকে সাদা চোখে ধরা যায় না, কেবল অনুভূতির স্তরেই যার প্রকাশ ঘটে। মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি, কিন্তু স্মৃতির মৃত্যু কেবল একজনের নয়, দুই ব্যক্তির মৃত্যু, যে স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তার ,আর যার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তার। দুই মৃত ব্যক্তিই এই রকম ক্ষেত্রে শোকবিবিক্ত থেকে যায়। অনিমেষের উপলব্ধি হয়েছে — "শুধু শীতাংশু কেন আরো অনেকের ক্ষেত্রেই তিনি মৃত, তারাও জীবিত নয়। তিনিও শোকরহিত, তারাও শোকরহিত।" অনুভূতি - উপলব্ধির মৃত্যুতে তারও মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু এই শবদেহ অসনাক্ত আর এই মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশের কেউ নেই এমনকি স্বয়ং মৃত ব্যক্তিও এজন্য শোক প্রকাশের অবকাশ বা সুযোগ কোনোটাই পায় না।

মৃত্যু কেবল নিছক মানব জীবনের সমাপতন নয়। মৃত্যুর পর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মানুষের স্বর্গ বা নরক লাভ করার একটি কল্পনাও জড়িত আছে । কিন্তু জীবিত মানুষের কাছে মৃত ব্যক্তি সকল ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার অতীত। আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় বা চলিত লেখায় আমরা মৃত্যুকে স্বর্গারোহণ বলেই মনে করি এবং উল্লেখ করি। ধর্মীয় বিধানে বা গ্রন্থে স্বর্গ বা নরকের প্রাপ্তি সম্পর্কিত বিষয় থাকলেও আমাদের চেতনায় নরক স্থান মৃত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয় না। মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-হীনতা-দীনতার বশবর্তী হতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পর সে সকল পার্থিব দৈন্যের উপর স্থান পায়। এই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'মৃত্যু' গল্পে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু বা শোক নির্ভর গল্পগুলিতে 'interior monologue' বা অর্ন্তমুখি আত্মকথনের একটি ভূমিকা রয়েছে। একটি মৃত্যুকে

কেন্দ্র করে কোনো ব্যক্তির সজাগ মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা প্রবাহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের গল্প গড়ে উঠেছে। এই অন্তর্মুখি আত্মকথনের মধ্য দিয়ে কথকের মানসিক অবস্থা তথা মানসিকতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে ঘটনাধারার স্বল্প বর্ণনা কিন্তু এই ঘটনার অভিঘাতে মানবমনের চিন্তার প্রবাহের বিস্তারকে বর্ণনা করে লেখক তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

'মৃত্যু' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ এর পূজা সংখ্যা 'বেতার জগৎ' - এ । গল্পের কাহিনি অংশে দেখা যায় প্রণবেশের বৃদ্ধ কাকার মৃত্যু সংবাদ প্রণবেশ প্রথম পায় টেলিফোনে। এই মৃত্যু সংবাদ তাঁকে বিচলিত করেছে বলে প্রণবেশ স্বীকার করেননি। কাকার মৃতদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যাবার সময়ও তিনি শোকগ্রস্ত হননি। লেখক প্রণবেশের মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে — "কাকার মৃত্যু সংবাদে এমন বিহ্বল হননি প্রণবেশ যে জামার বোতাম লাগাবার কথা তাঁর মনে থাকবে না — হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদে হোঁচট খাবেন কি বাসের হ্যান্ডেল ধরতে গিয়ে তা খুঁজে পাবেন না। প্রৌঢ় বয়সে, বৃদ্ধ কাকার মৃত্যুতে অতখানি শোকবিহ্বল কেউ হয় না। বিশেষ করে দীর্ঘকালের অদর্শনে আদান-প্রদানের অভাবে আবেগের সম্পর্ক যেখানে বহুকাল আগে থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসে সেখানে জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর সান্ত্বনা শোকের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।" প্রণবেশ হাসপাতালে যাচ্ছেন মৃত কাকার শবদেহকে সৎকারের প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে, কিন্তু এই মৃত্যুদীর্ণ দিনেও বাসে উঠে তার পছন্দমত বাসের সবচেয়ে অগ্রবর্তী আসনটিই তিনি দখল করেছেন। অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনের কোনো পরিবর্তন বা পার্থক্য আছে বলে প্রণবেশের বহিরঙ্গ আচরণে অনুভূত হয় নি, তিনি নিজেও অন্তরে কোনও পরিবর্তন অনুভব করেননি। বৃদ্ধ কাকার মৃত্যুতে প্রণবেশ শোক বিহ্বল হয়ে পরেননি তবে মাত্র তিন দিন আগে মৃত্যু পথযাত্রী কাকাকে দেখতে গিয়ে কাকাকে তিনি তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন বলে অনুতাপ করেছেন। কিন্তু সেই অনুতাপও প্রবল হয়ে উঠেনি বরং গত কয়েকদিনের মতো এদিনও তিনি এ বিষয়ে নিজের কৃতকর্মের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন।তার কাকা শ্রীবিলাস রায় পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা তাদের নিজের সহায়-সম্পত্তি, ভিটে-মাটিকে বিক্রয় করে দিয়েছেন। যদিও সেই ভিটে মাটির অধিকারকে প্রণবেশ সযত্নে রক্ষা করেন নি। সম্পত্তি রক্ষা করতে যেমন উদাসীন থেকেছেন তিনি তেমনই তা বৃদ্ধিও করেন নি। তবু প্রণবেশের ভাবতে কষ্ট হয়েছে, যে তার ঐ শৈশবের বাসগৃহ, বিচরণক্ষেত্র ,ঘরদোর, গাছপালা ক্ষেত খামার, বাবার কষ্টার্জিত সম্পত্তি আর নেই। এই দুঃখবোধ থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী কাকাকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, নিজের অন্তর্দাহকে উজার করে দিয়েছেন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকা বৃদ্ধের উপর। যতদিন বা যতক্ষণ বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন ততক্ষন প্রণবেশ ভেবেছে, তার কাজ সঠিক, কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার স্থানটি তিনি যথোচিত নির্বাচন করেন নি। প্রণবেশ ভেবেছেন — "কিসে কোথায় তাঁর অন্যায় হয়েছে? নিজের প্রাপ্য

সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েও তিনি কোন প্রতিবাদ করবেন না ? প্রতিবাদ না করলেই বরং অন্যায় হ'ত কিন্তু ঠিক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে তিনি যথোচিত কাজ করেন নি, যথোচিত কথা বলেননি। ফলে তাঁর উচিত কথাও গর্হিত হয়ে উঠেছে।" কিন্তু এই দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া, লাভ- ক্ষতির হিসেব সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে কাকার মৃতদেহের সামনে এসে।একদা প্রবল প্রতাপান্বিত মানুষটির মৃত দেহকে বড় করুণ ও অসহায় বলে মনে হয়েছে প্রণবেশের। বয়সকালের তেজ-দীপ্তি প্রাণ বিয়োগের বহু আগেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ দেহাধার থেকে বিদায় নিয়েছিল। তবু সেই মানুষটির মৃত মুখকে বড়ই বিষণ্ন ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ বলে বোধ হয়েছে প্রণবেশের। 'বীতশোক' গল্পে লেখক একটি আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন যে, শোকেরও অনুষঙ্গ দরকার। এখানে কাকার মৃতদেহই সেই অনুষঙ্গকে বহন করে এনেছে। অন্তরে শোকের উদয় হয়েছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ দেখা যায় নি। প্রণবেশের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু চোখে অশ্রুবিন্দুর উদয় হয় নি। নিজের মনে হয়েছে হৃদয় তার মরুভূমি, তাই চোখে তার অশ্রুবিন্দুও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। প্রণবেশের কেবলই মনে হয়েছে, তিনি মৃত্যু -পথযাত্রী কাকার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে যথোচিত ব্যবহার করেননি — "শেষ সাক্ষাতে কাকাকে তিনি শ্রদ্ধা দেখাতে পারেননি, ভক্তিতে অবনত হতে পারেননি নি। তাঁর রোগশয্যায়, সান্ত্বনায় আশ্বাসে একটি মধুর প্রীতিকর কথাও উচ্চারণ করেন নি, শুধু বঞ্চিত প্রতারিত হৃত সম্পদ অংশীদারের বিদ্বেষ বহ্নিতে তাঁকে জ্বালিয়েছেন , নিজে জ্বলেছেন। সেই অগ্নি জ্বালা এখন তার শোধ নিচ্ছে। এক বিন্দু হৃদয়রস এক ফোঁটা করুণা এক কণা অশ্রুও তাঁর জন্য অবশিষ্ট রাখেনি।" তবে চোখে জল না আসলেও প্রণবেশের অন্তর পরিবর্তিত হয়েছে, মানসিকতার রূপান্তর হয়েছে। জীবিত অবস্থায় কাকার ত্রুটিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি, কিন্তু কাকার মৃতদেহ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, কেবল ত্রুটি বা দোষের বিচারেই মানুষকে বিচার করা যায় না।দোষ গুণ নিয়েই মানুষ পরিপূর্ণতা পায়।লেখকের বিশ্লেষণ এই রকম — "মানুষ কোন একটি দোষের সঙ্গে অভিন্ন নয়, গুণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়, একই মানুষ দোষে-গুণে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।তবু আমরা দোষকে ক্ষমা করিনে, গুণকে গ্রহণ করি।" কিন্তু প্রণবেশ এই উপলব্ধির দ্বারা প্রথমে পরিচালিত হন নি, তাই কেবলমাত্র কাকার ত্রুটিগুলিকেই বড় করে দেখেছেন এবং তার ফলে মৃত্যুপথগামী মানুষটিকে অন্তরে আঘাত করতেও দ্বিধা করেন নি। কাকার মৃত্যুর পর তিনি কেবল তিক্ততার স্মৃতি নয়, কাকার বাৎসল্যের স্মৃতিও রোমন্থন করেছেন। স্মরণ করেছেন কাকার পছন্দমতো জামা কিনে দেবার কথা, জেলা শহরে প্রথম কলেজে থাকবার সময় প্রথমদিন কাকার স্নেহস্পর্শ ও ব্যবস্থাপনার কথা। শিশু বয়সে কাকার কাঁধে চড়ার স্মৃতি যখন প্রণবেশের স্মৃতি পথে উদিত হয়েছে তখন আর তাঁর চোখে অশ্রুর অভাব হয় নি বরং নিজের অজান্তেই তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠেছেন। এই স্বতোৎসারিত শোকাবেগে ও অশ্রুজলে যেন তাঁর পূর্বকৃত অন্যায় ধুয়ে গেছে। ভাইপো এসে তাঁকে সচেতন করে দিয়ে শবদেহ বহন করা থেকে

তাঁকে ক্ষান্ত করেছে। বলেছে — "তুমি পারবেনা জ্যেঠামণি।তুমি ছেড়ে দাও। অমন করে ছেলেমানুষের মত সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে এলে কি হাঁটা যায়?" এইভাবে দেখা যায় মৃত্যু এমন একটা ঘটনা যেখানে মানুষ এক পরম সত্যের সামনে এসে উপনীত হয় — যেখানে মানুষের দোষ ত্রুটি সব সমান হয়ে যায়। পার্থিব দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতির হিসাব সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষের হীনতা নীচতা পালাবার পথ খোঁজে। যে অমৃতধামের উদ্দেশ্যে মানব মৃত্যুর পর যাত্রা করে সেখানে মলিনতা নেই, মর্ত্য লোকেই সেই মলিনতাকে মানুষ ত্যাগ করে যায়।

নরেন্দ্রনাথ নিজে হয়তো স্বর্গ নরকের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'উন্মোচন' গল্পের কথক তথা রিলায়েবল ন্যারেটরের বর্ণনায় মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের ভাবনাই হয়তো প্রকাশিত হয়েছে — "মৃত্যু পরে কোন অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই। সবাই যেমন একমুঠো ছাই হয়ে যায় আমিও তেমন একমুঠো ছাই হয়ে যাব। তার কমও না, তার বেশিও না। মৃত্যুর পর কী হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। "

প্রেম, রাজনীতি, সংগ্রাম, স্মৃতি এগুলি সমগ্র জীবনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সম্পর্কিত বোধই একজন সাহিত্যিকের জীবনচেতনাকে গড়ে তোলে। সেই জীবনবীক্ষাই প্রতিফলিত হয় লেখকের প্রিয় সংরূপে — কখনো উপন্যাসে, কখনো নাটকে, কখনো কবিতায়, কখনো বা ছোটগল্পে। প্রায় ষাট বছরের জীবৎকালে নরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন অনেক কিছুই, তিনি অনুভব করেছিলেন আরও বেশি। সেই উপলব্ধি, সেই অনুভবের জগৎই তাঁর ছোটগল্পের বিশ্বটি গড়ে তুলেছে। এই অধ্যায়ে তাঁর গল্পের ভুবনে কেমনভাবে তাঁর স্বকীয় জীবনবীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে তা ই আলোচনার চেষ্টা করা হল।

-ঃঃ উল্লেখপঞ্জি ঃঃ-

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অনুষঙ্গিক ভাবনা', মাসিক বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪০৩.

২. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২১

৩. দিব্যেন্দু পালিত ঃ 'দেহমনের বৈতালিক', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা - ২৭০

৪. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫৭.

৫. ইরাবানু বসুরায় ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প', 'ভাঙ্গা কাঁচের শিল্প' সম্পাদক - অর্জুন রায়, পৃষ্ঠা - ১৩৩

৬.সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫৭.

৭. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮৮.

৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', 'গল্পমালা - ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১৯.

৯. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪১১.

১০. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১২. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪২৬.

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৬.

১৪. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১৫. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা ৪১৩.

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৮.

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৮.

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩৫.

১৯. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২৬৪.

২০. 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৬৮ সাল,

২১. অভিজিৎ মিত্র ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কিশোর গল্প সমগ্র' এর 'নিবেদন' অংশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮, পৃষ্ঠা - ৫.

২২. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা- সমীর বসু, পদক্ষেপ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৭.

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭.

২৪. গৌরমোহন রায় ঃ 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৫৮.

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৯.

২৬. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪২৩.

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৩.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।